(২২)

উপন্যাস সিরিজের

দ্বাবিংশ সংখ্যা

ঋণের দায়

'বিক্রমপুরের ইতিহাস', 'কেদার রায়', পরশমণি প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

১লা আষাঢ়, ১৩২৮।

শিশির পাবলিশিং হাউস

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট,

কলিকাতা।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

প্রকাশক—
শ্রীশিশিরকুমার মিত্র, বি, এ,
শিশির পাবলিশিং হাউস
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট,
কলিকাতা।

প্রিণ্টার—আবদুল গফুর,
নিউ ব্রিটেনিয়া প্রেস
২৪২-১, অপার সারকুলার রোড,
কলিকাতা।

স্নেহাস্পদ

শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ সেন

স্নেহাস্পদেষু।

জীবনে ঋণের দায় ভুগিতেছি যত,
মুক্তির সন্ধানে প্রাণ ব্যাকুলিত তত।
স্নেহের ঋণের দায় নাহি চাহি ভুলিবার,
তাই আজি তোরি হাতে দিনু এই উপহার!

ঋণের দায়

১

ভোরের বেলার সোনালি রৌদ্রের আভা ঘরের জানালার ভিতর দিয়া সবে মাত্র উঁকি দিয়াছে। প্রভা তাহার পিতার হাতের কাছে চায়ের বাটীটি ধরিয়া দিয়া কহিল "বাবা! আজ তোমায় এত মলিন ও বিবর্ণ দেখাচ্ছে কেন? তোমার কি কাল রাত্রিতে ভাল ঘুম হয় নাই?"

চন্দ্রকান্ত বাবু ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া প্রভার দিকে চাহিয়া কহিলেন "না, ঘুম হয়েছে বই কি মা! তবে শরীরটাত তেমন সুস্থ নয়, তার উপর এই দুঃসংবাদ! প্রভা একটী ছোট দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "বাবা! আমরাত তোমার কোন কাজে লাগবার উপযুক্ত হলেম না,—তুমি যদি বাবা অনুমতি কর, তা হলে একাজটা আমি নিয়ে ফেলি।"

বৃদ্ধ খানিক নীরব থাকিয়া কহিলেন—"সে আমি বেঁচে থাকতে কোন মতেই অনুমতি দিতে পারবোনা, মরে গেলে যা হয় করিস্, যতদিন বেঁচে আছি, ততদিন যে করেই হ'ক তোদের বোঝা বইব—আমাকে সে বোঝা থেকে কি এত সহজে মুক্তি দিতে চাইছিস্?"

পিতার এই করুণ বাণীতে প্রভার দুই চক্ষু বহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল—সে কহিল "ক্ষমা কর বাবা! আর আমি তোমায় কোন কথা কইব না, তবে এ বয়সে তোমার এই কষ্ট যে কোন মতেই দেখতে

দিনে, আমাদেরওত ছেলেদের মত কষ্ট করে লেখাপড়া শিখি... আমরাওত একেবারে অযোগ্য নই। আচ্ছা বাবা, সুধীর যখন উপ... করবে,তখন কি তার টাকা তুমি নেবেনা ? মেয়ে কি ছেলেদের চেয়ে...

চন্দ্রকান্ত বাবু উচ্চ হাস্য করিয়া কহিলেন—"সুধীর যদি মানুষ... তাহলে কি তোদের এত কষ্ট হত ? মেয়ের উপর বাপের যত... চলে—তার চেয়ে ছেলের উপর একটা বেশী দাবী যে সমাজই... দিয়েছেন মা !"

প্র... মুখ ভার করিয়া ধীর স্বরে কহিল—"এ বাবা, তোমার অ... বিচা...

"অন্যায় নয় মা, তোরা সংসারে এসেছিস্ পরের জন্য—এ... ছুয়া... ...তার স্নেহ তোদের ভুলবার জন্যই বিধাতা সৃষ্টি করেছে... এ ... সনাতন রীতি ; এর বিরুদ্ধে কোন বিধান চলে না।"

... আর কোন কথা কহিল না। সে চুপ করিয়া চা... পেয়া... লইয়া নাড়া চাড়া করিতে লাগিল। এমন সময়ে সুধী... ও বীণ... ...খানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

... বাবু ধীর স্বরে ছেলে ও কনিষ্ঠা কন্যার দিকে চাহিয়া কহিলেন "সুধী... দেখি ... যে, তুমি রোজই বেলা করে ওঠ, এ অন্যায় !"

সু... কহিল "এই ত বাবা, সবে আটটা বেজেছে। শীতের দিনে ভো... ...লা উঠা যে কি কষ্ট বাবা, সে বলে বোঝান যায় না। দুষ্ট বীণা ...কে টেনে তুলে এনেছে। দিদি ! আমাদের চা দাও ! উঃ ... পড়েছে।"

... দুই পেয়ালা চা তৈরী করিয়া উভয়ের সম্মুখে দিয়া কহিল,— "বীণ... মার এগজামিন যে ঘনিয়ে এল, এবারে একটু পড়াশুনোতে ভা... মন দাও, স্কলারসিপ না পেলে কি মুস্কিল হবে তাত বুঝতেই

বীণা কহিল—"কাল অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত পড়েছি দিদি—যা কিছু গোল ঐ সংস্কৃতটা নিয়ে, কি যে ছাই ধাতুরূপ আর ব্যাকরণ, কিছুতেই এটে উঠ্‌তে পাচ্ছিনে, তা না হলে আর সব সাব্‌জেক্টই দিব্যি তৈরী হয়েছে দিদি, তুমি দুপুরে একবার পরীক্ষা করে দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পারবে।"

সুধীর নিবিষ্ট মনে চায়ের পেয়ালাটা নিঃশেষ করিয়া কহিল—"বাবা, আজ আমি এক্ষুণি বের হব, আমাদের সঙ্গে আজ মধুপুর টীমের ক্রিকেট ম্যাচ। আমি সেখানেই খাব, শুধু স্নানটা বাড়ী থেকে সেরে নিতে চাই—না আর দেরী নয়।" চন্দ্রকান্ত বাবু ও প্রভা উভয়ে এক সঙ্গে কি যেন বলিতে যাইতেছিলেন কিন্তু তাহাদের কথা বাহির হইতে না হইতেই সে তড়াক্ করিয়া লাফাইয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল।

চন্দ্রকান্ত বাবু একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—"সুধীরকে মানুষ করতে পারলুম না। কেবল খেলা—আর ছুটাছুটি এই চাই। ভবিষ্যতে এ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তাই ভেবে ব্যাকুল হচ্চি। সুধীর মানুষ হলে যে আমার কোন কষ্টই হত না, বিধাতা ছেলের গৌরব আমাকে দিলেন না, ওর বয়সি ছেলেরা সব এম্ এ, পাস করে বড় বড় চাকরি সুরু করে দিলে, আর এ হতভাগা খেলার আমোদেই জীবনটাকে কাটিয়ে দিচ্চে—ভগবান্ যদি শুধু খেলার ভিতর দিয়েই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখ্‌বার কোন উপায় করে দিতেন, তা হলে সুধীরের কোন দুঃখু থাকৃত না।"

বীণা কহিল—"যাই বল বাবা, ছোড়্‌দার মত সাহসী ও যোয়ান মানুষ বড় কম দেখা যায়, যে রকম করে দৌড়ে দৌড়ে সেদিন পরেশনাথ পাহাড়ে উঠেছিলেন সব লোকগুলোত একেবারে অবাক্ হয়ে চেয়েছিল। শুধু পড়ার কথা বল্‌লেই তাঁর মন বেঁকে বসে, এই দেখনা আজ খেলায় ছোড়দাদাই সকলের চেয়ে বেশী 'রণ' করে আস্‌বেন।"

প্রভা কহিল—"তা ত বুঝ্‌লুম, কিন্তু এদিকে বাবা এই বুড়োবয়সে কি করে চালাবেন, সামান্য কয়টি পেন্সানের টাকায়ত আর সংসার চলে না, তারপর যে দিন পড়েছে, ওদিকে আমাদেরও কিছু কর্‌তে দিবেন না।"

"তা বাবা, টি সেয়ারের টাকাগুলো কি অম্‌নিই গেল, কিছুই পেলে না?" চন্দ্রকান্ত বাবু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—"আমাদের দেশের লোক এত ঠেকেও যে প্রবঞ্চনার হাত থেকে মুক্ত হচ্চে না কেন, সে কথাই বুঝে উঠ্‌তে পাচ্ছি না, বিদেশীরা যে ব্যবসায়ে হাত দিবেন তা'তেই সুফল ফল্‌বে, আর আমরা নিজেদের ভাই বন্ধুকে ঠকিয়ে একা বড়লোক হবার চেষ্টা করবো,—দেখনা কুড়িবছরের উপর চাঁদা দিয়েছি, কই একটা পয়সা পেলুম না, কাল কাগজে বেরিয়েছে কোম্পানী ফেল পড়েছে; এ দুঃসংবাদে আমি সারারাত ঘুমুতে পারিনি। সামান্য পঞ্চাশটি প্যান্সানের টাকায় কি করে তোদের নিয়ে দু'মুঠো খেয়ে থাক্‌বো?"

প্রভা কহিল—"সেই জন্যেইত বলি বাবা, আমি এখানকার গার্ল স্কুলের শিক্ষয়িত্রীর একটা কাজ নিয়ে ফেলি তবুও তোমার অনেকটা সাহায্য হবে।"

"সে আমি কোন মতেই দোব না—যতদিন বুড়ো হাড় কখানি থাকে, ততদিন সংসারটাকে টেনে নিয়ে যাব, তারপর যা হবার হবে।"

বীণা কহিল "বাবা, আজ বেড়াতে যাবে না?"

চন্দ্রকান্ত বাবু ধীরে ধীরে কহিলেন—"চল না।"

প্রভা কহিল—"বাবা, তুমি আমার কথা কয়টি আর একবার ভেবে দেখ। আমি এখন যাই।" সে ঘরকন্নার কাজ করিতে চলিয়া গেল, এমন সময় বৃদ্ধ ভৃত্য পার্ব্বতী আসিয়া কহিল—"বাবু, বাইরের ঘরে একজন বাবু আপনার জন্যে অপেক্ষা কচ্চেন, এখন দেখা করবেন কি?"

"কে রে? আর কখনও দেখেছিস্?'

আজ্ঞে কই, মনেত হয় না।

"আচ্ছা তাঁকে বস্‌তে বল, মা বীণা, তা চলে দেখ্‌ছি আজ আর বেড়াতে যাওয়া হল না! তুমি যাও লক্ষ্মীটি পড়াশুনা কর গে।"

চন্দ্রকান্তবাবু বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, একটী অপরিচিত যুবক বাহিরের ছোট ঘরটির বেতের চেয়ারখানা দখল করিয়া আছে, তিনি আসিবা মাত্র গাত্রোত্থান করিয়া নমস্কার করিয়া কহিল "আপনিই কি চন্দ্রকান্ত বাবু?"

চন্দ্রকান্ত বাবু বলিলেন—হাঁ!

"আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে, গোপনীয়, এখানে বল্‌তে পারি কি? একথা বলিয়াই সে ভিতরের দিকের দরজাটা নিজ হস্তে ভেজাইয়া দিয়া কহিল "বল্‌বো কি?"

চন্দ্রকান্ত বাবু আগন্তুকের এইরূপ অদ্ভুত আচরণ দেখিয়া বিস্মিত ভাবে কহিলেন—"বলুন।"

উভয়ে মুখোমুখি হইয়া দু'খানি চেয়ারে বসিলে পর অপরিচিত যুবক কহিল—'আমার নামটি আপনাকে বলা হয়নি, আমার নাম শ্রীযতীন্দ্রনাথ চৌধুরি। এমনি ভাবে আগন্তুক তাহার নামটি উচ্চারণ করিল যে চন্দ্রকান্তবাবুর মুখ দিয়া একটী কথাও বাহির হইল না, তিনি ভয়েও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন—এই পাষণ্ডের মুখ তাহাকে দেখিতে হইবে এ কল্পনাও তিনি কোনদিন করিতে পারেন নাই—এতদিন যাহার নাম শুধু বাহিরেই শুনিয়াছিলেন, আজ কিনা সে পাপিষ্ঠ আসিয়া দেখা দিয়াছে, অথচ সে নির্ভীক, কোন গ্লানি লজ্জা বা অনুতাপের চিহ্ন তাহার মুখে সুপরিস্ফুট নহে।

২

কোন কোন মানুষের এমনি দুর্ভাগ্য থাকে যে তাঁহারা যাহাতে হাত দেন তাহাই যেন ছাই হইয়া পুড়িয়া যায়। সোনার ফসলে আগুন ধরে—সলিল ভরা দীঘি শুকাইয়া যায়। চন্দ্রকান্ত বাবু বহুকাল শিক্ষকতা করিয়া অবসর লইয়াছেন। যৌবনে পাঠ্য-পুঁথি লিখিয়া অর্থ সঞ্চয়ের চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার লিখিত বহি একখানাও বিক্রয় হয় নাই, সামান্য পারিশ্রমিক লইয়া যাহাদিগকে নিজ স্বত্ব ছাড়িয়া বহি লিখিয়া দিয়াছেন, তাহারা সেই বহি বিক্রয় করিয়া আজ সংসারে দশ জনের একজন। অর্থের জন্য তিনি নানা দিক্ দিয়া নানা ভাবেই চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কোন ফলই পান নাই। মানিকপুরের জমিদার বিপিনবাবুর কন্যা সুমতি দেবীকে তিনি যখন হিন্দু সমাজে ছিলেন সেই সময়ে বিবাহ করেন; জামাতা ধর্ম্মচ্যুত হইয়া ব্রাহ্ম-ধর্ম্মাবলম্বী হইলে তিনি বহুদিন পর্য্যন্ত সুখ-লালিতা কন্যাকে এই হতভাগ্য বিধর্ম্মি পাষণ্ডের নিকট পাঠান নাই, কিন্তু শেষে কন্যার আগ্রহাতিশয্যে আর তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারেন নাই।

কন্যা যখন লজ্জা ছাড়িয়া দৃঢ় কণ্ঠে কহিল—"বাবা, স্ত্রীলোকের স্বামী ভিন্ন আর আশ্রয় কোথায়? আমি কোন মতেই এখানে থাক্‌বোনা,—তখন আর বিপিনবাবু কোন আপত্তি করেন নাই, সাগ্রহে ও সমাদরে কন্যাকে পতির নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

আদর্শ গৃহিণী—, আদর্শ সচিব ও সখিরূপে প্রায় দশ বৎসর পতির ঘর করিয়া আজ প্রায় কুড়ি বছরের উপর সতী-লক্ষ্মী স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন। যাইবার সময় পিতৃদত্ত নগদ দশ সহস্র টাকা ও প্রায় কুড়ি হাজার টাকা মূল্যের অলঙ্কার স্বামীর হাতে তুলিয়া দিয়া বলিয়া গিয়াছিলেন যে তাহার দুই কন্যার বিবাহে যেন এই অলঙ্কার যৌতুক দেওয়া

হয়, পুত্রবধূর জন্য যাহা কর্ত্তব্য তাহা যদি স্বামী বাঁচিয়া থাকেন তিনিই করিবেন, নচেৎ পুত্র তাহার বধূর ব্যবস্থা ত করিবেই, কিন্তু কন্যাদের দায়িত্ব মায়ের অভাবে কয়জন পিতা ভাল করিয়া লইয়া থাকেন? তাই সুমতি দেবীর এইরূপ বিধানে চন্দ্রকান্ত বাবু কোন আপত্তি করেন নাই। কন্যাদের যৌতুক ও বিবাহের ব্যয় সবই স্বামীর হাতে তুলিয়া দিয়া সতী-লক্ষ্মী পরপারে চলিয়া গিয়াছিলেন।

বিপিনবাবু নিজের হাতে কোলে পিঠে করিয়া মেয়ে দুটিকে ও ছেলেটিকে মানুষ করিয়াছেন। প্রভা, এম্ এ পাশ করিয়াছে। বীণা আই, এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। সুধীর, বীণার চেয়ে তিন বছরের বড়; কিন্তু সে তিনবার চেষ্টা করিয়াও ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিতে পারে নাই। এদিকে সে খেলাধূলায়, গানেবাজনায় অতি সুদক্ষ! শারীরিক শক্তিতে সে একজন বলশালী শিখ বা গোরাকেও হটাইতে পারে। বিশ বৎসর বয়সের এই তরুণকে পঁচিশ বৎসরের যুবকের ন্যায় দেখাইত। সে ছিল খেয়ালি, এতখানি বয়সেও সে সংসারটাকে খেলাধূলার স্থান ব্যতীত অন্য কিছু মনে করিত না! বৃদ্ধ পিতার মৃত্যু হইলে কেমন করিয়া সংসার চলিবে—এ পরিবারের কি হইবে সে ভাবনা কোন দিন সে ভাবে নাই। প্রভা ও চন্দ্রকান্ত বাবু কোন রূপেই এই চঞ্চল যুবকের চিত্ত সংযত ও কর্ম্মক্ষম করিতে না পারিয়া শেষটায় হাল ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এতগুলি দোষের মধ্যেও তাহার প্রধান গুণ ছিল চরিত্র—সে মিথ্যা বা ছলনার ধার ধারিত না, লেখা পড়া ব্যতিরেকে পিতার ও দিদির বাক্য সে অলঙ্ঘ্য বলিয়া মনে করিত।

পঞ্চান্ন বৎসর বয়সে অর্দ্ধেক বেতনেরও কিছু কম পেন্সান পাইয়া চন্দ্রকান্তবাবু হঠাৎ বিপন্ন হইয়া পড়িলেন, কি ভাবে ছেলে মেয়েদের লইয়া সামান্য দরিদ্র গৃহস্থের মতও সংসারটা চালাইবেন!

গিরিডিতে একখানা বাড়ী ছিল, এতদিন তাহাতে ভাড়াটিয়া থাকিত, এইবার নিজেই সে বাড়ীতে যাইয়া নিজেদের মাথা গুঁজিবার ঠাঁই করিয়া লইলেন। বীণা বোর্ডিংএ থাকিত। কোনরূপে তাহার বোর্ডিংএর খরচটা সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়া দিতেন। মেয়েদের বিবাহের জন্য নগদ যে দশ হাজার টাকা ব্যাঙ্কে মজুত ছিল সে টাকা গুলি নানা কোম্পানির সেয়ার কিনিয়া লাভের প্রত্যাশায় অজ্ঞাত দেশে চলিয়া গিয়াছিল। গিরিডিতে অভ্রের ব্যবসা বেশ লাভজনক, কোন কোন বাঙ্গালী এ ব্যবসায়ে বিশেষ লাভবানও হইয়াছেন, সেই মুগ্ধ লাভের প্রত্যাশায় একজন বিলাসী বাঙ্গালীবাবুর সহিত মিলিয়া একটা অভ্রের খাত ক্রয় করিয়া কন্যাদের যৌতুক স্বরূপ যে বাকী বিশ সহস্র স্বর্ণালঙ্কার গৃহিণী মজুত রাখিয়াছিলেন তাহাও শূন্যে মিলাইয়া গিয়াছে, এ খবর বাহিরের দু'চারিজনে জানিলেও প্রভা, বীণা বা সুধীর কেহই জানিত না। চন্দ্রকান্তবাবু পত্নী-প্রদত্ত কন্যাদের সম্পত্তি, অলঙ্কার গুলি ব্যবসায়ের লুব্ধ প্রলোভনে হারাইয়া ফেলিয়া দিন দিন ক্ষীণ ও মলিন হইয়া যাইতেছিলেন। এই সময়ে পেন্সানের পঞ্চাশটি টাকা ও সামান্য সঞ্চিত ধনের সুদের যে আয় হইত, তাহা হইতে অতি কষ্টে-সৃষ্টে দিনগুলি কোনরূপে মন্থর গতিতে চলিয়া যাইতেছিল। বুঝি তাহাও আর চলে না।

প্রভা আজকাল চন্দ্রকান্তবাবুর কাছে বাহিরের কোন অপরিচিত ব্যক্তি আসিলেই সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিত,—কোন্ কুগ্রহ আবার আসিয়া তাহার নিরীহ মনভোলা পিতার স্কন্ধে চাপিয়া বসিবে তাহার ত ঠিকানা নাই। এই দুরবস্থার সময়েও যদি কোন কোল কোম্পানী, চা কোম্পানী বা মাইকা কোম্পানীর অংশ বিক্রয়ের ক্যানভাসার আসিত তাহা হইলে তাহাকে সাদরে অভিনন্দিত করিয়া কি পরিমাণ সেয়ার কিনিলে ভবিষ্যতে একটা মোটা লাভ হইবে বৃদ্ধ সে কল্পনায় আত্ম-বিস্মৃত হইয়া পড়িতেন!

বিশ বছর যাবত এইরূপ নানা কল্পনায় জল্পনায় ধনী হইবার লুব্ধ আশায় নানারূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও তাহার ঘাড়ের ভূতটা এখনও ঘাড় হইতে দূরে সরিয়া যায় নাই। প্রভা পিতার এই খেয়ালটাকে দূর করিবার জন্য বহুবার ব্যর্থ প্রয়াস পাইয়াছে—কিন্তু সফলকাম হয় নাই। সেদিন ভোরে পিতার বিষণ্ণ মুখ দেখিয়াই সে বুঝিতে পারিয়াছিল যে আজ হয়ত আবার কোন কোম্পানী 'ফেল' পড়ার সংবাদ আসিয়া পঁহুছিয়াছে, পরে যখন দেখিল যে তাহার অনুমান সত্য তখন এত দুঃখের মধ্যেও সে না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। কেন এই আকাঙ্ক্ষা? কাহাদের জন্য? এই ষাট বছরের বৃদ্ধ যে মরীচিকার পশ্চাতে ছুটিয়া চলিয়াছেন এত তাহাদেরি কল্যাণের জন্য!

গিরিডিকে ব্রাহ্ম-উপনিবেশ বলিলেই ঠিক হয়; এখানে বাঙ্গলা দেশের নানা জেলার যতবেশী ব্রাহ্মের বাড়ী তত বড় একটা বাঙ্গলার বাহিরে দেখা যায় না। এখানে ধনী ও নির্ধন সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মই বাস করেন। কোন কোন ব্রাহ্ম-পরিবারের মহিলারা পুরুষ অভিভাবক ভিন্ন স্বতন্ত্র ভাবেও বাস করিয়া আসিতেছেন। সুবিধাও অনেক, কারণ ছেলে মেয়েদের পড়াইবার মত স্কুল, সমাজ ও স্বাধীনভাবে চলাফেরার সকল রকম সুযোগই এখানে আছে। দূরে পরেশনাথপাহাড়ের নীলশৃঙ্গে শ্বেত জৈন মন্দিরের চূড়া মেঘের ছায়ায় দিব্য পরিস্ফুট,—আঁকা-বাঁকা উশ্রী নদীর শীর্ণ গতি, হরিতকিবনের ঝিলিমিলি পাতার আড়ে তরুণ তপনের লুকোচুরি—আর দিগন্ত বিস্তৃত উঁচুনীচু মাঠের সীমানায় বিক্ষিপ্ত পর্বত-শ্রেণী—সত্যসত্যই কল্পনার রঙিন নেশায় চিত্তকে বিভোর করিবার মত প্রচুর আয়োজন লইয়া অবস্থিত আছে। এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে একটা প্রীতি ও একতার ভাব যেমন আছে বাঙ্গালায় আপন মাটিতে তাহা তেমন নাই।

উশ্রীর ধারে চন্দ্রকান্তবাবুর বাড়ীখানা ঠিক্ ছবির মতই দেখিতে সুন্দর। বিপিনবাবু কন্যার ও জামাতার জন্য এই বাড়ীখানা করিয়া দিয়াছিলেন। সন্তানের শত অন্যায় অত্যাচারও যে পিতামাতা কত সহজে ভুলিয়া যাইতে পারেন তাহার দৃষ্টান্তের বড় বেশী অভাব নাই, আর এক্ষেত্রে ধর্ম্মের জন্য যাহারা হিন্দু-সমাজেরও দেশাচারের গণ্ডী ছাড়াইয়া আসিয়াছে তাহাদের উপর অভিমান আর কতদিন চলে? এই বাড়ীতেই স্বামীর পায়ে মাথা রাখিয়া সুমতি দেবী পরপারে চলিয়া গিয়াছেন, এই বাড়ীর প্রতি কক্ষে, এই বাড়ীর বাগানের আম-কাঁঠাল-দেবদারু তরুর নির্ব্বাক বুকে যে সেই মৃতা রমণীর কত স্নেহ লুকাইয়া আছে আজ যদি তাহারা মুখ ফুটিয়া কথা বলিতে পারিত তাহা হইলে তাহার অনেকখানিই প্রকাশ পাইত। এখনও সেই বাড়ী, সেই ঘর, সেই শোভাসৌন্দর্য্য তেমনি আছে, শুধু এই ঘরের যিনি কল্যাণী লক্ষ্মী ছিলেন তিনি আর নাই! চন্দ্রকান্তবাবুর বড় সাধ এখানেই তাহার জীবনের শেষ বায়ুটুকু মিলাইয়া যায় তাই এখানেই তিনি স্থায়ীরূপে বাস করিতেছিলেন। সৌভাগ্যের মধ্যে বাড়ীখানা এখনও মর্টগেজে বাঁধা পড়ে নাই।

যতীনের পরিচয় পাইয়া চন্দ্রকান্তবাবু হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিলেন—"তুমি—তুমি কেন এখানে, কিসের জন্য এসেছ?" যতীন কহিল,—"আপনি বুদ্ধিমান ও প্রাচীন ব্যক্তি আমার বিশ্বাস যে আপনি একটা শুনো কথার উপরে নির্ভর করে আমার প্রতি কখনও বিমুখ হবেন না,—আমার শুধু এই অনুরোধ আমার যা কিছু বল্‌বার আছে সে কথা কয়টি যদি অন্ততঃ শুনবার মত আপনি একটু অবসর দিতেন তাহলে আমি অনেকটা আনন্দ পেতেম—"

চন্দ্রকান্তবাবু কহিলেন—"আমি কিছু শুনতে চাই না—শুন্‌বার কোনও প্রয়োজন নেই—"

যতীন্ মৃদু হাসিয়া বিস্মিতভাবে কহিল—"আপনিও যদি আমায় কোন কথা বল্‌বার অধিকার না দেন—সেটা যে বড় দুঃখের কারণ হবে। একটু ধৈর্য্য, একটু অবসর দিলেই যে আমার বক্তব্যটা শেষ কর্‌তে পারি। তারপর আজই আমার কল্‌কাতা যাওয়ার দরকার, ঝরিয়াগঞ্জের কোল সেয়ার যতগুলো পারি কিনে ফেল্‌তে হবে—দেখ্‌তেইত পাচ্ছেন, কোলের বাজার যে রকম চ'ড়া, এ সময়ে একটা দাঁ না মারতে পারলে শেষটায় পস্তাতে হবে।"

মন্ত্রের গুণে কিংবা ওঝার হাতের গুণে যেমন দুর্দ্দান্ত সর্প পোষ মানে, কোলসেয়ারের কথাটা শুনিয়া চন্দ্রকান্তবাবুর স্বরটা একটু নামিয়া আসিল, তিনি চেয়ারখানার উপর বসিয়া ধীরে শান্তভাবে কহিলেন—"কোল সেয়ার?"

"আজ্ঞে চড়বেই ত দেখ্‌বেন, দশ টাকার সেয়ার শেষটায় হাজার টাকায়ও মেলা দায় হবে, বলে দিচ্ছি।"

"তা তুমি এ পর্য্যন্ত কতগুলি সেয়ার কিনেছ?"

"আজ্ঞে দশহাজার সেয়ার।"

চন্দ্রকান্তবাবু বিস্মিত হইয়া কহিলেন "বল কি? ওরা কি ডিভিডেণ্ড দিতে সুরু করেছে?"

"আজ্ঞে এবারই সেন্টপারসেন্ট ডিক্লেয়ার কর্‌বে।"

'সত্যি?'

আপনার গুটি কয়েক সেয়ার চাইত, এইবার কিনে দিই, শেষটায় পাবেন না, বল্‌তে কি গুটি দশপনের সেয়ার কিনে রাখ্‌লে আপনার আর কারু কাছে হাত পাত্‌তে হবে না! বেশ আরামেই বাকী দিন কাটিয়ে যেতে পার্‌বেন।

চন্দ্রকান্তবাবু এইবার একটু আগ্রহ প্রকাশ করিয়া কহিলেন—"তঃ

কি করবো বাবা, আমার হাতে এমন কিছু নেই যে কতকগুলি সেয়ার কিনে ফেলতে পারি।"

যতীন্ হাসিয়া কহিল—"সে টাকার জন্যে ভাববেন না. আচ্ছা আমি আপনার জন্য যতগুলো পারি সেয়ার কিনে আনবো, আপনার যখন সুবিধে হবে, তখন টাকাটা দিবেন।"

সহসা প্রভা বিদ্যুতের মত বেগে সেখানে উপস্থিত হইয়া কহিল—"কখখনো না, সে হবে না বাবা, আর আমি তোমাকে এমন করে পরের হাতে সর্ব্বস্ব সঁপে দিয়ে ভিখারীর বেশে দোরে দোরে যেতে দেখতে রাজি নই—সে কখখনো হবে না।" প্রভা রান্না প্রস্তুত করিয়া পিতাকে স্নান করিবার জন্য আহ্বান করিতে আসিয়া দেখিতে পাইল তিনি তখনও ভিতরের ঘরে আসেন নাই, বাহিরে তাঁহার কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছে। সে অধীর হইয়া উঠিল, বুঝিল হয়ত আবার কোনও দুষ্ট লোক তাহার এই মনভোলা পিতাকে ঠকাইবার জন্য আসিয়াছে। তাই সে আর নিজেকে সামলাইতে পারিল না, একেবারে সে কক্ষমধ্যে যাইয়া প্রবেশ করিয়া রুদ্ধস্বরে পিতাকে একটা মর্ম্মান্তিক নিষেধ-বাণী শুনাইয়া দিল। কোন লজ্জা, কোন সঙ্কোচ তাহার আর তখন ছিল না।

এইরূপ ভাবে আবার প্রভাকে দেখিতে পাইবে, যতীন্ সে আশা করিতে পারে নাই। প্রভাও ভাবে নাই যে—যে পুরুষ তাহাকে একদিন লাঞ্ছনার মুকুট পরাইয়া সংসারের চক্ষে ঘৃণিত ও অপমানিত করিবার চেষ্টা পাইয়াছিল—আজ আবার তাহারই সম্মুখে এমনি অতর্কিত ভাবে আসিয়া তাহাকে দাঁড়াইতে হইবে? প্রভার সারা দেহের উপর দিয়া যেন একটা আগুনের তপ্তজ্বালাপূর্ণ বাতাস বহিয়া গেল! সে পলকমধ্যে সে কক্ষ ছাড়িয়া অন্তঃপুরের দিকে চলিয়া আসিল। তাহার শরীর থর

থর করিয়া কাঁপিতেছিল, সে দাঁড়াইতে পারিতেছিল না, ঘরে ঢুকিয়াই বিছানার উপর গা ঢালিয়া দিল।

যতীনের মুখ দিয়া আর কোন কথা বাহির হইতেছিল না। রূপের যে এমন উন্মাদনা শক্তি আছে, সে আজ তাহা যেমন গভীর ভাবে অনুভব করিল, পূর্ব্বে আর তেমন করে নাই। শ্রান্ততরুণীর উজ্জ্বল গৌরকান্তির উপরে লাবণ্যের যে আনন্দ-তরঙ্গ পবিত্রতার দীপ্ত মাধুরীতে সমুজ্জ্বল, সেদিকে চাহিয়া থাকিবার শক্তি তাহার নাই! বিদ্যুতের চমকের দিকে নয়ন তুলিতে না তুলিতেই যেমন তাহা মিলাইয়া যায়, প্রভা ঠিক্ তেমনি ভাবে চলিয়া গেলে যতীন্ কিয়ৎকাল চুপ করিয়া রহিল, তারপর আপনাকে সংযত করিয়া ধীর স্বরে কহিল—"তা হলে আপনি যদি অনুমতি করেন, আপনার জন্যেও পাঁচ সাত শ সেয়ার কিনে ফেলি, আপনি সুবিধে মত টাকাটা দিয়ে ফেল্‌বেন সে ত আগেই বলেছি।"

চন্দ্রকান্তবাবুর রঙ্গীন কল্পনা, আকাশ-কুসুমের মত কোল সেয়ারের লাভের অঙ্কের যে টাকাগুলি গুণিতেছিল, তাহা প্রভার ঐরূপ আকস্মিক আবির্ভাবে, কোথায় মিলাইয়া গেল! তিনি যে অভিযোগের কথা শুনিয়া যতীনের প্রতি বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিলেন, এইবার আবার সেই বিদ্রোহের ভাব জাগিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন—"না, না ওসবে আমার কাজ নেই, তুমি আর আমার এখানে এস না।"

যতীন্ এইরূপ একটা ব্যবহার প্রভার আবির্ভাবের পর হইতেই প্রত্যাশা করিতেছিল। সে কহিল—"যদিও আপনি আমার কোন কথা শুন্‌লেন না, তবু আমার যে কর্ত্তব্য আছে সেটা শেষ না করে কোন মতেই স্থির থাকতে পাচ্ছি না। সেদিন প্রভাকে বিপদের হাত থেকে আমিই রক্ষা করেছিলুম—নিজ সমাজের একটি শিক্ষিতা মেয়ের মান-সম্ভ্রম রক্ষা করাই আমি সকলের চেয়ে শ্লাঘ্য মনে করি। তবু যদি আপ-

-নার মনে হয় যে আমার দ্বারা তার সুনামের হানি হয়েছে, তবে আমার সঙ্গেও ত তার বিবাহ হতে পারে। সমাজ কোন কথা বল্‌বারই অধিকার পাবে না।"

চন্দ্রকান্তবাবু বিস্মিত হইলেন, এইরূপ ভাবে কোন দিন কোন যুবক তাঁহার সঙ্গে কথা বলিতে সাহসী হয় নাই। শিক্ষক-জীবনে তাঁহার পদশব্দ শুনিবামাত্র ছাত্রেরা বেঞ্চে শান্তভাবে উপবিষ্ট থাকিত, বেত্র প্রহারে জর্জ্জরিত না করিয়াও যাহার এত বড় প্রতাপ ছিল, আজ তাহারই সমক্ষে একজন উদ্ধত ব্রাহ্ম-যুবক এমন সব কথা বলিয়া যাইতেছে যাহা কোনরূপেই সহিষ্ণুতার সহিত গ্রহণ করিবার নয়, অথচ তাহার বিরুদ্ধে বলিয়াও কোন ফল হইবে না। তাই তিনি বিস্মিত ভাবে বিবর্ণ মুখে কহিলেন—"আমি তোমার কোন কথা শুনতে চাই না—তুমি যাও।" শুভ্র মালতী পুষ্পের ন্যায় নিষ্কলঙ্ক ও পবিত্র তেজস্বিনী কুমারী কন্যার নামে মিথ্যা কলঙ্কের বাণী শুনিয়া কোন পিতার হৃদয় শান্ত ও স্থির থাকিতে পারে? আজ বৃদ্ধের দুই চক্ষু বাহিয়া বেদনার অশ্রুধারা নামিয়া আসিতেছিল। তিনি আর সেখানে ক্ষণমাত্র অপেক্ষা না করিয়া সদর দরজার দিকে অগ্রসর হইতেই, যতীন্ রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—"নমস্কার! তা হলে আসি চন্দ্রকান্তবাবু! এই কোল্ সেয়ারের কথাটাও খোলাসা করে বল্লেন না।" তাহার কথা শেষ হইতে না হইতেই বাহিরের দরজাটা বন্ধ করিয়া তিনি বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেলেন।

৩

গগন বিশ্বাস যেমন একপুরুষে বড়লোক, অর্থে ধনী হইয়াছে, খুব কম বাঙ্গালীর ভাগ্যলিপিই তেমন আশ্চর্য্যরূপে ফিরিয়া যায়। ব্যবসা করিয়া আজ সে দেশের একজন শ্রেষ্ঠ ধনী। এখন তাহার কাজ শুধু বাঙ্গলার সীমায় বদ্ধ নহে বিলাতের ও আমেরিকার বড় বড়

কোম্পানীর সহিত তাহার কারবার। কলিকাতা, বোম্বাই, লাহোর, দিল্লী, মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থানে তাহার আফিস। বহুলোক তাহাতে খাটে, বহুপ্রকারে তাহার অর্থাগম। বাণিজ্যের ভিতর দিয়াই যে লক্ষ্মী আসিয়া বাস করেন, বিশ্বাসের জীবনী হইতেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

গগন জাতিতে নমঃশূদ্র। দেশে সে যখন সামান্য মুদী দোকানখানা চালাইত, তখন নিজের ও তাহার বৃদ্ধা জননীর সামান্য ব্যয়টা কোনরূপ চলিয়া যাইত। ভদ্রসমাজে মিলিতে মিশিতে সে খুব ভালবাসিত। কিন্তু এই ভদ্রসমাজে মিশিতে যাইয়াই সে একবার গ্রামের জমিদার বাড়ী হইতে অপমানের বোঝা মাথায় করিয়া ফিরিয়া আসে—বিধাতা তাহাকে চণ্ডালের ঘরে জন্ম দিয়াছেন বলিয়াই কি সে এত বড় অধঃ-পতিত? তাহার সামান্য ছায়ামাত্র ছুঁইলে ব্রাহ্মণের আর্য্যামি নষ্ট হইয়া যায়! মানুষ মানুষকে এত বড় ঘৃণা করিতে পারে, এ কল্পনা তাহার মাথায় কোন দিন আসে নাই।

ছেলেবেলায় যে সকল উচ্চবর্ণের ভদ্রলোকের ছেলেরা তাহার সহিত পাঠশালায় লেখাপড়া করিয়াছে, তাহারা গগনের সহিত যে সামাজিক জীবনেও কোন পার্থক্য আছে তাহা মাত্রেই অনুভব করিত না, একদিন গ্রামের কোনও সামাজিক উৎসব উপলক্ষে—পাড়ার সকলে গগনকেও তাহাদের সঙ্গে সভামণ্ডপে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল। যে বয়সে সমাজের সঙ্কীর্ণতা ও হীনতা মানুষকে হিংসা, দ্বেষ ও ঘৃণার চক্ষে কাহাকেও দেখিতে শিখায় না, সেই বয়সেই যুবকেরা গগনকেও কোন অংশে তাহাদের চেয়ে হীনও ও অস্পৃশ্য বলিয়া মনে করিত না। তাহারা গগনের সঙ্গে কতদিন একত্র মিলিয়া চড়ুই ভাতি খাইয়াছে,—তাহার ত সীমা সংখ্যাই নাই। এইরূপ মেলামেশার বিরুদ্ধে বাহিরে এতদিন ততটা উচ্ছ্বাস শোনা যায় নাই, কেহ কোন নিষেধ-বাণী প্রচার করে নাই,

কিন্তু সেই বিশেষ উৎসবের দিনে গগনকে লইয়া যুবকের দল যেমনি জমিদার বাড়ীর আঙ্গিনায় যাইয়া উপস্থিত হইল, অমনি একটা তুমুল কোলাহল পড়িয়া গেল, বিদ্যালঙ্কার মহাশয় জাতিধর্ম্মের এইরূপ দারুণ অধঃপতনে ঘন ঘন টিকি নাড়িয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন। জমিদার বাবু ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া স্বহস্তে নিরীহ গগনের পৃষ্ঠদেশ পাদুকা-লাঞ্ছিত করিয়া তৃপ্তিলাভ করিলেন। হতভাগ্য গগন কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী ফিরিয়া গেল। গগনের উপস্থিতিতেই নাকি ধর্ম্মানুষ্ঠানটী নষ্ট হইয়াছিল।

কথাটা লইয়া নিজেদের চণ্ডাল মহলেও একটু গোলমাল হইল। মোড়ল রামচরণ মণ্ডল গগনকে কহিল—'কেমন জব্দ! দু'পাতা লেখা-পড়া শিখেই যে তোরা ভদ্রলোক হ'তে যাস,—তার ফল হাতে হাতে পেলি ত! খবরদার আর ও মুখো হস্‌নে। এ অপমান তোর একার নয়, আমাদের সমাজের, এর শোধ না নিয়ে ছেড়ে দিচ্ছিনে। বুঝলি!'

ইহার পর গগন নিজ বাড়ীর বাহিরের ঘর খানিতে একখানা বড় দোকান ফাঁদিয়া বসিল। গ্রামের প্রয়োজনীয় নিত্য নৈমিত্তিক দ্রব্যাদি চাল, ডাল, তেল নুনের সঙ্গে সঙ্গে সে এমন সব খেলনা, পুতুল ও জামা জুতা দিয়া দোকানখানা সাজাইল যে অল্প দিনের মধ্যেই তাহার সেই মুদীদোকান খানা দু'দশ ক্রোশের লোকেরও একটা আকর্ষণ স্বরূপ হইয়া উঠিল। এখন সে আর দোকানখানি ছাড়িয়া কোথাও বাহির হইত না। ভোরের বেলা দোকানের ঝাঁপ খুলিয়া জলের ছিটা দিয়া ধুনি জ্বালাইয়া নিজের মনে নিবিষ্ট চিত্তে বেঁচাকেনা করিত। কেমন করিয়া তাহার হাত-দুটো পয়সা জমায়েত হয় তাহাই তাহার একমাত্র লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইল।

একদিন যাহারা তাহাকে দেখিলে ঘৃণায় মুখ ফিরাইত, কিংবা জমিদার বাড়ীর অপমানের দিনে তাহাকে বিদ্রুপের অট্টহাস্যে লাঞ্ছিত

করিতে ছাড়ে নাই, আজ কিন্তু তাহারাই আবার ভোরে ও সন্ধ্যায় গগনের দোকান ঘরে হাজিরা দিতে আরম্ভ করিল—এমনি ভাবে নিয়ত যাতায়াত করিতে কেহ কোন দিন দুই সের চাউল ধারে লইয়া যাইত, কেহ বা দু'টো টাকা ধার চাহিত, কেহ বা গগনকে বিবাহ করিয়া সংসারী হইবার জন্য নানারূপ আত্মীয়তা জানাইয়া স্নেহ প্রদর্শন ক'রত। গগন কাহারও কোন তর্কে বা স্নেহের আলাপে বিচলিত হইত না। সে নিজের মনে শুধু ব্যবসার উন্নতির জন্য তাহার সমুদয় শক্তি নিয়োগ করিয়াছিল।

এইভাবে চারি বৎসর ব্যবসায় চালাইয়া মাতার মৃত্যুর পর গগন হঠাৎ নিরুদ্দেশ হইল, নিরুদ্দেশ হইয়া যে কোথায় চলিয়া গেল, দেশের লোকে আর সে সন্ধান পাইল না।

পাঁচ হাজার টাকা পুঁজি লইয়া সে কলিকাতায় একজন মাড়োয়ারির সহিত মিলিত হইয়া বাঙ্গলার নানাস্থানে পাটের কারবার করিয়া বেশ সঙ্গতিপন্ন হইল। মাড়োয়ারী গগনের ক্ষমতা, পরিশ্রম ও ব্যবসায় বুদ্ধি দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। গিরিডিতে তখন অভ্রের খাত কিনিবার জন্য মানুষের একটা নূতন আগ্রহ জন্মিয়াছে—তখন পর্য্যন্তও কেহ ব্যবসাটাকে বিশেষ করিয়া আয়ত্ত করিয়া উঠিতে পারে নাই। এ সময়ে মাড়োয়ারী জহরমলের এ ব্যবসায়টার দিকে অতিরিক্ত ঝোঁক পড়িয়া গেল। জহরমল গগনকে কহিল তুমি গিরিডি যাইয়া কতকগুলি খাতের বন্দোবস্ত কর;—একদিন এ ব্যবসায়ে বিস্তর মুনাফা হবে, এ আমি জোর করে বলতে পারি। টাকার জন্য ভাবনা করোনা।' জহর-মলের উপদেশ পাইয়া সে গিরিডির কতকগুলি খাতের বন্দোবস্ত করিল। এই বন্দোবস্ত করিতে যাইয়াই সে এমনি বুদ্ধি ও কৌশলের পরিচয় দিয়াছিল যে বিচক্ষণ মাড়োয়ারী জহরমল মনে মনে তাহাকে সহস্র

ধন্যবাদ দিয়া প্রকাশ্যভাবে ব্যবসায়ের ছয় আনা অংশীদার করিয়া পাকা-পাকি লেখাপড়া করিয়া দিল—ব্যবসায় চালাইবার ভার রহিল গগনের উপর। এই ব্যবসায় দ্বারা কেমন করিয়া সে প্রচুর লাভ করিল এবং শেষটায় অন্যেব কারবারের দ্বারা শ্রেষ্ঠ বণিক্ হইল সে কথা বলিবার কোনও আবশ্যক করে না। মোটের উপর ঠিক্ ত্রিশ বৎসর বয়সের সময়ই গগন বিশ্বাস একজন প্রসিদ্ধ ধনবান্ ব্যক্তিরূপে পরিচিত হইয়া উঠিল।

অর্থের সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে, সমাজের প্রতি একটা বিদ্রোহের ভাব জাগিয়া উঠিল। হিন্দু সমাজের সর্ব্বত্রই জাতিগত সংকীর্ণতা-ছোঁয়াচে রোগ—কাজেই যৌবনের প্রথম ভাগে যে সমাজের হাতে সে লাঞ্ছিত হইয়াছে, সে সমাজের বুকে আর তাহার থাকিতে ইচ্ছা হইল না,—সে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিল। বিশ্বাস উপাধি ছাড়িয়া চৌধুরী পদবীটা নামের সহিত সংযুক্ত করিল। ব্রাহ্মসমাজও এইরূপ একজন অর্থশালী ব্যক্তিকে আপনাদের সমাজের ভিতর পাইয়া গৌরব বোধ করিলেন। জাতিগত হীনতা অস্পৃশ্যের ঘৃণিত অপমানেব জ্বালা আর তাহাকে পাইতে হইল না। সে ব্রাহ্মসমাজের একজন বিশিষ্ট পৃষ্টপোষক, স্ত্রীশিক্ষার পরম উৎসাহদাতা, দরিদ্র ব্রাহ্মভ্রাতাদের দুঃখ দুর্দ্দশার পরম সহায়। ব্রাহ্ম হইবার দু'তিন বৎসর পর একজন বিধবা ব্রাহ্ম-মাহিলার সহিত তাহার বিবাহ হইল। এই বিধবার নাম প্রমদা দেবী। প্রমদাদেবীর পিত্রালয় হুগলী জেলায়। সে কুলীন-কন্যা,—একজন যাট বৎসরের বৃদ্ধের সহিত তাহার বিবাহ হইবার কয়েকমাস পরেই সে বিধবা হইল। বৃদ্ধের ভাগিনেয় রূপসী ও যুবতী মাতুলানীকে দুর্দ্দশার শেষ অবস্থায় আনিয়া ব্রাহ্ম সমাজের বারান্দায় ফেলিয়া একদিন যে কোথায় পলাইয়া গেল কেহ তাহার সন্ধান পাইল না। গ্রাম্য নিরীহ যুবতী সমাজের প্রচারক মহাশয়ের অনুকম্পায় আশ্রয় পাইয়া, অকূলে কূল পাইল। প্রচারক

বামনদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয় শুধু যে আশ্রয় দিয়াছিলেন তাহা নহে, তাহার শিক্ষা দীক্ষারও সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। প্রমদা তাঁহার তত্ত্বাবধানে থাকিয়া এণ্ট্র্যান্স পরীক্ষায় যে বৎসর উত্তীর্ণা হইল সে বৎসরই মিঃ গগন চৌধুরীর সহিত তাহার শুভ পরিণয়োৎসব সম্পন্ন হইল। এই মিলনের ফলে—চারি বৎসরের মধ্যেই একটী পুত্র ও একটী কন্যা জন্ম-গ্রহণ করিল। পুত্র যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী চারিবার বি, এ ফেল করিয়া পিতার ব্যবসায়ের উন্নতির দিকে মন নিবেশ করিয়াছে। আর কন্যা অনীতা বি, এ, পড়িতেছে। এ পরিবারের কর্ত্তা, চৌধুরী সাহেব নামে পরিচিত, গৃহিণী চৌধুরাণীকে মেমসাহেব বলিয়া কেহ সম্বোধন না করিলে তিনি চটিয়া লাল হন্।

মিসেস চৌধুরী, সত্য সত্যই অদ্বিতীয়া রূপসী ছিলেন। কিন্তু পুত্র ঠিক্ বাপের অনুরূপ হইয়াছিল, লম্বা, হাড়মাসে জড়িত বাহু, গায়ের রং কতকটা আবলুশ কাঠের মত,—চুলগুলি ককশ,—গালের দুইদিকের চোয়াল অস্বাভাবিক রকমের উচু। নাকের মাঝখানটা নীচু,—আর পুরু ঠোট দু'খানিতে অস্বাভাবিক নির্লজ্জতার পরিচয় দিত। চক্ষু দুইটী —বিড়ালের চক্ষুর ন্যায় তীক্ষ্ণ। সে কখনও নিম্নস্বরে কথা বলিতে পারিত না। মেজাজ সর্ব্বদাই রুক্ষ ও খিট্‌খিটে ছিল। সাজ সজ্জার দিকে তাহার অতিমাত্রায় লক্ষ্য ছিল। সাহেবী পোষাক ছাড়া সে সাধারণতঃ বড় অন্য পোষাক পরিতে ভালবাসিত না—আর মিঃ চৌধুরী না বলিলে সে মনে মনে ভারি অসন্তুষ্ট হইত। সভ্য-সমাজে মিশিতে হইলে মদ খাওয়াটা দরকার, কারণ যত বড় লোক সকলেই মদ খায়, বিশেষ সাহেবদের সঙ্গে মিশিতে হইলে ত মদ না খাইলেই চলে না,—কাজেই প্রতিদিন সন্ধ্যায়ই তাহার বৈঠকে মদের আমদানীটা চলিত।

অনীতা সত্য সত্যই সুন্দরী—গায়ের রংয়ের তুলনা করিতে গেলে ইহুদী মেয়েদের সঙ্গে তুলনা করিলে তাহা অন্যায় হয় না। সে লেখাপড়ায় গীতে গানে, কথাবার্ত্তায়, সব বিষয়েই সকলের নিকট সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল। এ সকল গুণের মধ্যে তাহার একটী দোষই অনেকের চক্ষে নেহাৎ অন্যায় এবং অমার্জ্জনীয় বলিয়া মনে হইত, —সেটি তাহার অহঙ্কার। অনীতা প্রতি পদবিক্ষেপে, প্রতি বাক্য-বিনিময়ে,—সাজ-সজ্জায় বুঝাইয়া দিত যে সে ধনীর মেয়ে। কোন সঙ্গিনী যদি তাহার ব্যবহৃত কোন জিনিষের খোঁজ লইতে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিত—'ভাই, এ জিনিষটা কোন্ দোকান থেকে আনিয়েছিস্?' অনীতা তখন গম্ভীর মুখে গর্ব্বের ভঙ্গিমায় কহিত—'এটা ভাই Indiaতে পাবে না, বাবা, জার্ম্মাণ ফার্ম্ম থেকে আমার জন্য Direct, order দিয়ে আনিয়েছেন।' জিজ্ঞাসু সঙ্গিনীর চক্ষু ত জবাব শুনিয়া তালুর উপর যাইয়া উঠিয়াছে। এই গর্ব্বিতা তরুণী ধনী ও সম্ভ্রান্ত ঘরের তরুণ ও তরুণীদের সঙ্গ ব্যতীত অপরের সহিত মিশিতে চাহিত না। অর্থের এই আভিজাত্য—এই অহঙ্কার তাহার সমুদয় গুণকে ম্লান করিয়া অনেকের নিকট তাহার সঙ্গ অসহনীয় করিয়া তুলিয়াছিল।

এইবার মিঃ চৌধুরী ও চৌধুরীণীর বিষয় একটু বলিয়া লই। মিসেস চৌধুরী বাস্তবিকই বড় ভালমানুষ। জীবনে সমাজের অন্যায় নির্ম্মম বিধানে হাবুডুবু খাইয়া একদিন পথ হারাইয়া যে কলঙ্কের বোঝা মাথায় লইয়াছিলেন—আজ তাহা স্মৃতির অতল তলে ডুবিয়া গিয়াছে। মিসেস চৌধুরী—সে ত্রুটি প্রাণ দিয়া পরিশোধ করিয়াছেন, স্বামীর সুখের জন্য ও শান্তির জন্য তিনি না করিতে পারেন এরূপ কোন কাজই তাহার ছিল না। গৃহস্থালীতে সুনিপুণা, শান্ত সুশীলা এই নারী মিঃ চৌধুরীর গৃহের সত্য সত্যই কল্যাণী লক্ষ্মীরূপে বিরাজমানা ছিলেন।

দোষের মধ্যে তাহার ধর্ম্মের গোঁড়ামি কালাপাহাড়কেও হার মানাইয়াছিল। হিন্দু সমাজের প্রতি তাহার দারুণ বিদ্বেষ ছিল—কোন হিন্দু-পরিবারের সহিত তাহার কোনও ঘনিষ্ঠতা ছিলনা। কেহ মিশিতে আসিলেও এমনি ঘৃণার সহিত তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতেন যে কোন ভদ্র মহিলার পক্ষে ঐরূপ অভদ্র ব্যবহার পাইয়া সাক্ষাৎ করিবার আর কোন আকাঙ্ক্ষা জন্মিত না।

মিঃ চৌধুরী খাটি ব্যবসায়ী লোক। তিনি দিনরাত ব্যবসায়ের হিসাব লইয়াই সময় কাটাইতেন, আর এখানে সেখানে সর্ব্বদা ঘুরিয়া বেড়াইয়া ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য মননিবেশ করিতেন। অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টা ও অর্থ সঞ্চয়ের ব্যবস্থা ব্যতীত তাহার কাছে আর কোন বিষয়ই স্থান পাইত না। শৈশব হইতে যে শিক্ষার দ্বারা তাহার জীবন গঠিত হইয়াছে—তিনি সেই শিক্ষাটাকেই জীবনে সর্ব্বতোভাবে সার্থক করিবার জন্যই জীবন-পথের লক্ষ্য স্থির করিয়া লইয়াছিলেন। মিঃ চৌধুরী—স্বল্পভাষী, চতুর ও বিচক্ষণ ব্যবসায়ী বলিয়া বণিক্‌সমাজে সুপরিচিত ছিলেন। কি মাড়োয়ারি মহলে, কি সাহেব মহলে, সর্ব্বত্রই তাহার সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। তিনি ঘরে ও বাহিরে সাহেবীভাবেই চলাফিরা করিতেন। বাড়ীতে বয়, খানসামা, বেয়ারায় ভরপূর্ত্তি ছিল। তাহাদের সকলেই মুসলমান। সংসারের খাওয়া দাওয়া চলাফেরা সব বিষয়ে সম্পূর্ণ ভার ছিল মিসেস চৌধুরীর। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যাহারা ফরিদপুরের রাধা-নগরবাসী গগন বিশ্বাসকে দেখিয়াছে, এখন আর তাহাদের কোনরূপেই তাহাকে মিঃ চৌধুরীরূপে সনাক্ত করিবার সাধ্য নাই। অনবরত সাবান ব্যবহারে ও সাহেবী পোষাক পরিয়া চলাফিরা করায় গায়ের রং ধূসর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গোফ দাঁড়ি কামান, চশমা শোভিত ও নিয়ত সিগার পানে ব্যস্ত—ধীর, স্থির প্রবীণ ব্যবসায়ী চৌধুরী সাহেবের যে

একটা পুরাণ কাঠাম ছিল তাহা খুঁজিয়া বাহির করা অতি বড় গোয়েন্দার পক্ষেও সহজ নয়। সাধারণতঃ মিঃ চৌধুরী কলিকাতায় বালিগঞ্জের বাড়ীতে থাকেন, কিন্তু প্রতি বৎসর শীতের সময়টা গিরিডিতেই কাটিয়া যায়।

যতীনকে বি, এ, পাশ করিলেই বিলাত পাঠাইয়া ব্যারিষ্টার করিয়া আনিবেন, ইহাই তাহার প্রাণের একান্ত কামনা ছিল। একমাত্র ছেলেকে ছাড়িয়া থাকিতে গৃহিণী সম্মত হইলেন না, কাজেই বিদ্যাশিক্ষার দিকে আর বিশেষ লক্ষ্য না করিয়া তাহাকে ব্যবসায়ী করিয়া তুলিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। পুত্রও বহির বোঝা ছাড়িয়া দিয়া সম্মুখে আনন্দের রঙ্গিন পেয়ালা দেখিতে পাইয়া তাহাই গলাধঃকরণ করিবার জন্য সেইদিকে ধাবমান হইল।

৪

চন্দ্রকান্তবাবু বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া কোথাও প্রভাকে দেখিতে পাইলেন না। স্নানের যায়গায় জল প্রস্তুত, এমন কি কাপড় গামছাখানা পর্য্যন্ত যথাস্থানে রক্ষিত। ভৃত্য পার্ব্বতী বারান্দার ধারে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। সূর্য্য মাথার উপর আসিয়াছে। চন্দ্রকান্তবাবু কহিলেন,—"পার্ব্বতী! তোর দিদিমণি কোথায়?"

"আজ্ঞে রান্নাবান্না করে শোবার ঘরে গেছেন!"

"বটে।"

"বাবু আপনি স্নানটা সেরে ফেলুন, আজ বড় বেলা হ'য়ে গেছে। কে এসেছিল বাবু?"

"সে কথা নিয়ে তোর কি দরকার? দিদিমণিকে ডেকে দে।"

প্রভা পিতার পায়ের শব্দ পাইয়াই তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে উঠিয়া চোখের জল মুছিয়া বাহিরে আসিবার উদ্যোগ করিতেই পার্ব্বতী ঘরের

দরজার সামনে দাঁড়াইয়া কহিল,—"দিদিবাবু! কর্ত্তা, আপনাকে ডাক্‌ছেন।"

প্রভা ধরা গলায় কহিল,—"বাবা তেল মেখেছেন ত?"

"আজ্ঞে না।"

প্রভা বিস্মিত হইয়া কহিল,—"কেনরে? তুই কি কোন কথা বলিস নাই নাকি? এতটা বেলা হ'য়ে গেল।" সে তড়িৎপদে পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল—"বাবা, তুমি ত কোন দিন এত বেলা করোনা, আজ কেন মিছামিছি বকে বকে এতটা দেরী করলে? আমাদের বড় লোক হবার কোন দরকার নেই। অভাব দূর করবার জন্য টাকার যতটা প্রয়োজন, তার বেশী আমাদের কোন আবশ্যক নেই। বেশ আছি, যে সে এসে বাড়ী ঢুক্‌বে, তা আমি কোন মতেই সইতে পারবো না।"

চন্দ্রকান্তবাবু মৃদুস্বরে কহিলেন—"তোর বাবা, এ জীবনটা ভুল করেই কাটিয়ে দিয়ে গেল। কেমন যে ভোলা মন, কতবার মনে করি যে আর এ সব হুজুগে মাতবো না, কিন্তু পেরে উঠি কই। এটাও বেশ বুঝি যে এ শুধু একটা খেয়ালের নেশামাত্র। কিন্তু সে নেশাতো কিছুতেই কাটাতে পারি না! দেখি যদি মনটাকে সবল করে এবার এ দুর্ব্বলতাটাকে ভেঙ্গে চুড়মার করে দিতে পারি। এ জন্যেইত কল্‌কাতা থেকে পালিয়ে এসেছিলুম। এখানেও যে কেউ ঘুরে বেড়াচ্ছে তাত জান্‌তুম না।'

প্রভা কহিল—'এখন আর ও সব কথার দরকার নেই বাবা, তুমি যা ভাল বুঝবে তাই করো, তবে কিনা, তোমার কষ্ট দেখে প্রাণটা কেমন কেঁদে উঠে, তাই মনের আবেগে দু'টো কথা না বলে থাক্‌তে পারি না। আমায় মাপ করো বাবা!'

প্রভার মনের মধ্যে যে একটা অশান্তির প্রবল ঢেউ সজোরে বহিয়া

যাইতেছিল যাহার আঘাত শুধু প্রাণের মাঝখানটাই আলোড়িত করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই, বাহিরেও সদর্প উচ্ছ্বাসে বাহির হইয়া আসিয়াছে, তাহা সে বেশ উপলব্ধি করিতেছিল। পাছে অসাবধানে অসংলগ্ন ভাবে সে বাক্যোচ্ছ্বাস বাহির হইয়া আসে, এজন্য সে সতর্কতার সহিত কহিল— "বাবা, ঢের বেলা হয়ে গেছে, 'আমি খাবার ঠিক্ করিগে—তুমি তাড়াতাড়ি নেয়ে এস।"

প্রভা যে ভাবে জীবনে শিক্ষালাভ করিয়া আসিয়াছে, কলেজে পড়া মেয়েরা আজকালকার দিনে সে রকম শিক্ষা বড় একটা পায় না। সে যেমন পড়াশুনায় প্রতি বৎসর বৃত্তির টাকাটা লুফিয়া লইয়াছে, তেমনি মাতৃহীন পরিবারের জ্যেষ্ঠা কন্যা হইয়া গৃহস্থালী সম্পর্কে সে বাল্যকাল হইতেই গৃহিণীর পদবীতে আরোহণ করিয়াছিল। বাপের সেবা, ছোট দুরন্ত ভাইটীও ছোট ভগিণীটির আহার, বিশ্রাম খেলাধূলা সকল বিষয়েই লক্ষ্য রাখিয়া এমনি সুশৃঙ্খলার সহিত এ কয় বৎসর চালাইয়া আসিয়াছে। নিজ হাতেই সে রান্নাবান্না ও ঘরকন্নার সব কাজ করিত। বাহির হইতে দুই একদিনের পরিচয়ে কেহ বুঝিতে পারিত না যে এই মেয়েটী তাহার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের ভিতর বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকটা বিদ্যা বোঝাই করিয়া রাখিয়াছে। অথচ সর্বদিকে এমনি একজন দক্ষ সুনিপুণা তরুণীর সন্ধান পাওয়া বাঙ্গালাদেশের নারী সমাজেও খুব সুলভ নহে। শিক্ষার সবগুলি দিক্ বজায় রাখিয়া সংসারে শিক্ষিত এই নামের গৌরব-রক্ষা করা যে কত বড় কঠিন কাজ সে ধারণা অনেকেই করিতে পারেন না। স্ত্রী-শিক্ষার যে সমস্যা লইয়া পৃথিবী ব্যাপী আন্দোলন চলিতেছে, তাহার মূলেও যে এইরূপ একটা গুরুতর সমস্যা চলিতেছে তাহা সভ্য-জগতের সর্ব্বত্রই আন্দোলনের সহিত পরিস্ফুট। গৃহস্থালীর দিকটা উপেক্ষা করিলে যে সংসার অচল হইয়া উঠে, কেবলমাত্র দাস, দাসী,

ঠাকুর, চাকর, বয়, খানসামার উপর নির্ভর করিলে যে চলে না তাহা অনেক পরিবারের মাত্রই উপলব্ধি নাই। বিলাসিতা ও আত্মনির্ভর-হারাভাব প্রতিপদে দাসত্বের হীনতায় আমাদিগকে অবনত করিলেও আমরা সেদিকে ফিরিয়াও চাহি না,—আমাদের মত আত্মবিস্মৃত জাতি জগতে বড একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। পৃথিবীর কোন জাতি পরকে আমাদের মত এত আপনার করে লয় নাই,—সে শুধু দাসত্বে নয়, প্রত্যেক আচার অনুষ্ঠানে। তাই ত প্রতি পদে লাঞ্ছনার পাদুকা আমাদের শিরে নানাদিক্ হইতে আসিয়া বর্ষিত হইতেছে! পুরুষ আমরা যেমন অক্ষম ও দুর্ব্বল—আমাদের নারী-সমাজও তেমনি অচল ও স্থবির কর্ম্মে উৎসাহহীনা, স্বাস্থ্যে অপটু, প্রতি পদ-বিক্ষেপে আত্মবিস্মৃত হইয়া ধ্বংসশালের আলোর পশ্চাতে ধাবমান হইতেছে। এ জীবনে—এ অবসাদের মধ্যে যে দিন না নবীন উৎসাহের দীপ্ত বহ্নি জ্বলিয়া উঠিবে, ততদিন পুরুষ ও নারী অমনি ভাবে ধীর মন্থর গতিতে পতনের পঙ্কিল হ্রদে ডুবিবেই। এ অবসাদ দূর করিতে হইবে, এই দাসত্বের শৃঙ্খলের বন্ধন চূর্ণ করিয়া ফেলিতে হইবে, মুক্তির মুক্ত বাতাসে আপনার জীবনকে নবীনভাবে সঞ্জীবিত করিতে না পারিলে কখনই সার্থকতার উজ্জ্বল উৎসাহের দীপ্তিতে আমরা গৌরবান্বিত হইতে পারিব না।

যতক্ষণ না চন্দ্রকান্তবাবুর খাওয়া শেষ হইল সে পর্য্যন্ত প্রভা তাঁহার আসনের কাছে বসিয়া রহিল—আর কোন প্রসঙ্গই সে তুলিল না। চন্দ্রকান্তবাবু আহার করিতে করিতে কহিলেন 'মা!, সংসারে অর্থের অভাবে যে মানুষকে কত খাটো করে দেয়, যে কোনদিন অর্থের অভাব বোধ করেনি সে সেটা কোন মতেই উপলব্ধি করতে পারে না। অভাবের ন্যায় অধীনতা, মানুষের জীবনে আর নাই। আমি দিন দিন সে অধীনতা অন্তরে বাহিরে ও পূর্ণরূপে অনুভব কচ্চি।'

প্রভা হাসিয়া কহিল, "বাবা, অভাবকে বড় করে দেখ্‌লেই অভাব এসে চেপে বসে। আমরা যদি অভাবকে দোরগোড়ায় উঁকি মার্‌তে না দিই তাহলে ত কোন দুঃখের সম্ভাবনা নেই। সুখ দুঃখ মনের রাজ্যের উপরই আধিপত্য করে, মনকে তাদের বশীভূত না করে, যদি শাসনাধীন প্রজা করে তুলি তাহ্‌লে আর দুঃখ, কষ্ট কি ?"

চন্দ্রকান্তবাবু হাসিয়া কহিলেন "মা, তুমি কথাটাকে যত সহজ বলে মনে কচ্চ, সেটা কি তত সহজ ? এ জীবনে কত ঘূর্ণিপাক খেয়েছি, কত বন্যার বাণে ভেসে গেছি—তবু ত সুখ বলে যে একটা শান্তি সে আস্বাদটা পেলাম না। জীবনে এমন শুভদিন কখনও এল না, যে সময়ে মনে হল যে একটু নিশ্চিন্ত হয়েছি। জানিনা—কখনও হবে কি না !"

প্রভা খানিক নীরবে থাকিয়া কহিল "ব্যর্থতা যেখানে আসে, সেখানেই ক্লেশ পাওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু যেখানে ব্যর্থতাকেই আস্‌তে দেবো না, সেখানে আর দুঃখ করবার কি থাক্‌তে পারে ! আকাঙ্ক্ষা ও লোভকে যত কমিয়ে আনা যাবে, ততই জীবনে শান্তি আস্‌বে। আমরা যদি সে ভাবটা শুধু কল্পনায় নয়, কার্য্যেও প্রাণের ভিতর আন্‌তে পারি তবেই ত জীবনের দুঃখ, দৈন্য আশা নিরাশার দোলনার হাত থেকে নিস্তার পাই। মনের ভেতর শান্তি অনুভব করলেই শান্তি পাব, সে শান্তিকে পাবার আকাঙ্ক্ষাই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা।"

চন্দ্রকান্তবাবু আর কোন কথা না কহিয়া নীরবে আহার শেষ করিয়া হাত মুখ ধুইয়া চলিয়া গেলেন। আজ তাহার মনে প্রভার কথা কয়টি একটা নূতন আলোক আনিয়া উপস্থিত করিল। অর্থলাভের যে দারুণ আকাঙ্ক্ষা লইয়া তিনি এতদিন সংসার-পথে চলিয়া আসিতেছেন, তাহার সেই সার্থকতা কোথায় ? জীবনে অভাবের যে দারুণ কষাঘাত তাহার শত সুখ কল্পনার বুকে নিরাশার বজ্র নিক্ষেপ করিয়া অনল জ্বালাইয়া

দিয়াছে, তাহাত জীবনে এখনও নিবিল না! জীবনের অপরাহ্নে—সম্মুখে যখন গভীর ঘন কালো মেঘের সুগভীর আস্তরণ,—সেই মৃত্যুলোকের অন্ধকার দেশে, এ বাসনার পরিণতি কোথায় যাইয়া মিলাইবে কে তাহা বলিতে পারে?

বিছানার উপর শুইয়া পড়িয়া—শৈশব হইতে বার্দ্ধক্যের এই শেষ সীমানা পর্য্যন্ত যেভাবে যেরূপ নানা অবস্থান্তরের ভিতর দিয়া চলিয়া আসিয়াছেন, আজ সে সকল কথাই শুধু তোলপাড় করিতে লাগিল। যতদিন গৃহিণী বাঁচিয়াছিলেন, ততদিন জীবনকে এত বড় শূন্য এত বড় দুর্দ্দশাগ্রস্ত বলিয়া মনে হয় নাই। কিন্তু আজ বড় শূন্য বড় দীর্ণ বড় অভাবগ্রস্ত এ জীবন তাঁহার নিকট বোধ হইতেছিল। একটা কিছু অবলম্বন চাই—একটা কিছু আশার অবলম্বন ব্যতীত মানুষের জীবন চলে না, তাই অর্থ লাভের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার জীবনে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। শুধু যে অর্থলাভ তাহাও ত নহে—দেশের উন্নতির দেশের শিল্প-বাণিজ্যের কল্যাণকামনাও কি তাহাতে ছিল না? কিন্তু যে কার্য্যে সিদ্ধি নাই, চিরদিনই সে কার্য্যে প্রশংসা ঘটে না। যাহার জীবন শুধু ব্যর্থতার ভিতর দিয়াই চলিয়া আসে তাহাকে কে কবে প্রশংসা করে?

৩

"তোমার শিক্ষার জন্য আমি সর্ব্বস্বান্ত হয়েছি, বাবা! এখন তোমার উপরই আবার এ সংসারের আশা ভরসা উন্নতি অবনতি, সব নির্ভর করে।"

"আমায় কি করতে হবে বলুন!"

কথা হইতেছিল পিতা ও পুত্রের মধ্যে। রাজা রমণীমোহন রায় রাম-পুরের জমিদার। সম্পত্তির আয় সদর খাজনা ইত্যাদি বাদ দিয়া পঞ্চাশ

পত্রের অভাব নাই। রমণীবাবুর বয়স ষাটের কাছাকাছি—চুলগুলি প্রায় সবই পাকা। কাঁচাপাকা দাড়ি বক্ষ পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে। গায়ে একটী পশমী গেঞ্জী, তিনি একখানা কৌচের উপর হেলান দিয়া বসিয়া গড়গড়ার নল টানিতে টানিতে কথা বলিতেছিলেন। প্রভাতের গায়ে একটী পাঞ্জাবী—পায়ে এক জোড়া চটি, সাদাসিধা ধরণের একখানা কাপড় পরা। গোঁপ দাড়ির লেশমাত্র মুখে নাই। অতি সুশ্রী সবল যুবক। রং খুব ফর্সা—বড় বড় কালো দুইটী চক্ষু। মাথায় ফ্যাসানানুযায়ী চুলকাটা। চোখে মুখে একটা প্রতিভার জ্যোতিঃ খেলিয়া বেড়াইতেছে, দেখিলেই মনে হয় তাহার কার্য্য করিবার একটা ক্ষমতা আছে এবং কষ্ট-সহিষ্ণুতাও যথেষ্ট আছে। প্রভাত ধীর ভাবে পিতার কথা শুনিতেছিল। পিতার কথায় পুত্র কহিল,—"বাবা! আমি কি করতে পারি বলুন ?"

'তুমিই সব পার বাবা। সংসারে তুমি ছাড়া আর আমার কে আছে বল। আজ যদি গৃহিণী থাকৃতেন, তবু আমার মাথার বোঝা অনেকটা হাল্কা বলে মনে হত। দুর্ভাগ্য আমার তাই তিনি চলে গেলেন। আমি এখন ঋণের জ্বালায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছি, আর সহ্য হয় না। এতদিন কোন মতে পিতৃপুরুষের চালটা বজায় রেখে এসেছি কিন্তু আর ত পারি না বাবা! একটা যা হয় বিহিত কর।'

প্রভাত হাসিয়া কহিল—"আমি ত বাবা! এখন গাছের ছায়ায় আছি, সংসারের কোন ধারই ধারি না, আমাকে আপনি যে ভার দিবেন, আমার যতটুকু সাধ্য আমি সে ভার বইতে চেষ্টা করবো।"

"সে ত ঠিক্ কথা বাবা। ধনপতি শেঠের টাকাটা সুদ সমেত প্রায় দেড় লাখ টাকা দাঁড়িয়েছে, এক বৎসরের ভিতর ওটার একটা হেস্ত নেস্ত করতে না পারলে যে আর কোন মতেই মান থাকে না। আপা-

ততঃ সেটার একটা ব্যবস্থা দরকার। প্রভাত চমকিয়া উঠিল। ছাত্র-জীবনের সহজ সরল পথে এতদিন চলিয়া সে সংসারের কোন সংবাদই রাখে নাই। তাহার কাছে পিতার এই ঋণের কথাটা এমনি অস্বাভাবিক মনে হইল যে অকস্মাৎ গুরুতর আঘাত পাইলে মানুষ যেমন চমকিয়া উঠে, তেমনি চমকিয়া উঠিয়া বিস্মিত ভাবে কহিল—এত টাকা ?"

গড়গড়ার নলটা একপাশে সরাইয়া রাখিয়া কৌচের উপর বসিয়া রমণীবাবু কহিলেন,—"শুধু যদি দেড় লাক্ টাকা ঋণ হ'ত তাহলে ততটা ভয়ের কারণ ছিল না, রামপুরের সা'দের কাছেও প্রায় দু' লাক্ হবে, তারপর খুচরা বাজারদেনাও নেহাৎ ন্যূনপক্ষে মোটামুটি লাক্ খানেক হবে; ম্যানেজার বাবুর কাছে সব টাকারই একটা হিসাব আছে। ম্যানেজার বাবুকে ওসব হিসেব পত্র নিয়ে একবার কল্‌কাতা আসতে লিখব তখন সব নিজচক্ষে ভাল করে দেখে শুনে নিও।"

"বাবা! এত টাকা ঋণ কি করে হল। কই, আমাদের ত তেমন খরচের কোন দরকার পড়েছিল বলে মনে হয় না। আমার একটী বোন্‌ও নেই যে তার বিয়ের বাবদও কতকগুলো টাকা খরচের দরকার হতে পারে। তারপর যে ভাবেই চলাফিরা করি না কেন, পঞ্চাশ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি হ'তে বেশ নাম প্রতিপত্তির সহিত সংসার-ব্যয় নির্ব্বাহ হয়ে দু' পয়সা বরং জমা হবারইত সম্ভাবনা ছিল।"

নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া একটু বিরক্তির সহিত রমণীবাবু কহিলেন,—"হরকান্তের মত যদি আমি পয়সা বাঁচিয়ে দশজনের সঙ্গে আদর আপ্যায়ন না করে চলতুম তাহলে আমার ঋণ হ'ত না, কিন্তু আমাকে দশজন সাহেব সুবা যেমন আদর আপ্যায়ন করেন, কই তাকে ত কেউ ডেকেও জিজ্ঞেস করে না। জেলার কালেক্‌টর বল, কমিশনার বল, সকলেই আমাকে স্নেহ করেন, কিন্তু হরকান্তের নামও কি কেউ শুনেছেন ?"

প্রভাত মৃদু স্বরে কহিল—"দেশে এসে হরকান্তবাবুর ত খুবই সুনাম শুনছি। বরং আমাদের সাধারণের কাছে সেরূপ সুযশ শোনা যায় না।"

"ও সব কথা ছেড়ে দাও। ও সব শুন না। কতকগুলো চাষা-ভূষার কাছে সুনাম পাওয়া সহজ, কিন্তু দেশের দশজন ভদ্র লোক যাকে মানুষ বলে মনে করে না, সে রকম নাম যশ দিয়ে কি লাভ?"

"আমি আপনার সঙ্গে কোন তর্ক করতে চাই না। যে রকম শুনেছি, তাই আপনাকে বল্লুম, আপনার কাছে কেন ঋণ হল, সে কথা তুলতে চাওয়াও আমার ধৃষ্টতা। সে সব কথা যাক্ বাবা, এখন আমরা কি করতে হবে আজ্ঞা করুন।"

'তবে শোন বাবা, আমার মনে হয় তুমি যদি দু'টী কাজ কর, তাহলে এ ঋণের দায় থেকে উদ্ধার পেতে পারি। প্রথম তুমি একটী সরকারী চাকরী লও, দ্বিতীয়তঃ কোন বড় লোকের মেয়েকে বিবাহ করো, সে যে সমাজেরই হউক না কেন, তা বলে তোমায় হিন্দু বা ব্রাহ্মসমাজের বাইরে যেতে বলছিনে।"

'প্রভাত খানিক চিন্তা করিয়া মৃদুস্বরে কহিল—"বাবা, এ দু'টীর একটীতেও আমি রাজি নাই। চাকরী জিনিষটা আমি কোনদিন পছন্দ করি না, সে সরকারীই হউক, আর বেসরকারীই হউক,—অধীনতা চিরদিনই পাপ। তারপর বিবাহ, সে বিষয়ে ত আমি এ পর্য্যন্ত ভাব্-বারই অবসর পাই নাই। জীবনের একটা লক্ষ্য স্থির না করে, আমি কোন মতেই সংসারের বোঝা ঘাড়ে নিতে রাজি নই।'

রমণীবাবু নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। বহুক্ষণ তাঁহার মুখ হইতে কোনও কথা বাহির হইল না। পরে ধীরে চিন্তিতভাবে কহিলেন—"তাহলে উপায় কি বাবা?

'উপায়, নিজেদের কাজ নিজেদের করা। মোটা মাহিয়ানার ম্যানেজারের কোন প্রয়োজন নেই, আপনি নিজে জমিদারী দেখুন, ব্যয় সংক্ষেপ করুন, নিশ্চয়ই ঋণ শোধ হবে। কল্কাতায় থেকে একটা নাম বাড়ান, আমার মনে হয় কোন দরকার নেই। আমাদের দেশের স্বাস্থ্যও ভাল—তারপর খাদ্যাদিও সুলভ। আর যদি আপনি আজ্ঞা করেন, তাহলে আমি নিজে একবার জমিদারীটা বেড়িয়ে আসতে চাই—হিসাব নিকাশ গুলো নিজে বুঝে নিতে চাই। জমিদারীর একটা বিলি ব্যবস্থা করে, তারপর আমি নিজেও একটা আয়ের উপায় করবো। আমার দৃঢ় বিশ্বাস—সবদিকে ব্যবস্থা হলে, ৪।৫ বৎসরের মধ্যেই আমাদের সব ঋণ শোধ হয়ে যাবে।'

রমণীবাবু মনে মনে এ ব্যবস্থাটা পছন্দ করিতেছিলেন না, কারণ, তিনি জীবিত থাকিতেই কিনা পুত্র জমিদারীর তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করিবে! প্রভাত যখন কথা বলিতেছিল তখন রমণীবাবুর মনের এই ভাব তাহার মুখে চোখে নানাভাবে প্রকাশ পাইতেছিল। রমণীবাবু কহিলেন—"ম্যানেজারবাবুকে তুলে দিয়ে, তুমিও দূরদেশে থাকলে কি করে কাজ চল্‌বে? তারপর সংসারের বার মাসের ক্রিয়া পার্ব্বণ চালিয়ে জমিদারির আয় থেকে আর ঋণ শুধবার মত কত টাকা বাঁচাতে পারবে? আমার ত মনে হয় না বাবা, তোমার এই ব্যবস্থা খুব কার্য্যকারী হবে। তবে—পরীক্ষা করে দেখতে পার এই মাত্র। আমার মনে হয় তুমি যদি চাকরী নিতে আর একটা ভাল ঘরে'—প্রভাত বাধা দিয়া কহিল—"বাবা, আপনার মনে আঘাত দিতে আমার প্রাণে কষ্ট হয়, কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞা—আমি কখনও চাকরী করব না, আর পূর্ব্ব হতেই আমার যে পণ ছিল উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ না করে সংসারী হব না, সংসারের ঋণের কথা শুনে সে প্রতিজ্ঞা সম্বন্ধে আমি আরও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলেম।

পরের কাছে মাথা হেঁট করে চলা আমি নেহাৎ অপমানের বিষয় বলে মনে করি। বাবা—ঋণের জ্বালা বড় জ্বালা—বার মাসের পার্ব্বণ বুঝি না—সুখ-স্বচ্ছন্দ বুঝি না—যতদিন পর্য্যন্ত না ঋণ শোধ হবে, ততদিন কোন মতেই পূর্ব্বের ন্যায় ব্যয় ব্যাসন চালান আমি কর্ত্তব্য মনে করি না। আবার যখন পূর্ব্বের সমৃদ্ধি ফিরে আসবে, তখন সবই করতে পারব, আপনাকে আমি অঋণী—ঐশ্বর্য্যশালী এবং প্রজার প্রিয় জমিদার দেখতে চাই বাবা। আপনি শুধু একটী বৎসরের জন্য জমিদারীর কার্য্যভার আমার হাতে সঁপে দিন।"

রমণীবাবু কহিলেন—'তুমি উপযুক্ত শিক্ষিত সন্তান, তোমার হাতে ভার দিতে আমার কোনও আপত্তি নেই। তবে বার মাসের ক্রিয়া-পার্ব্বণ স্বজন সাহেব-সুবা ভদ্রলোকের আদর আপ্যায়ন আমি দেশের বাড়ীতে বাস করে যদি না হয়, সেটা বড় লজ্জা ও অপমানের কথা হবে, সে লজ্জা বা অপমান আমি সইতে পারবো না। তুমি যা ভাল বোঝ কর—কিন্তু আমার বিদেশে থাকবার ব্যবস্থা করে দিও, কিংবা যদি তুমি যেখানে ব্যবসা-বাণিজ্য করবে, সেখানে তোমারি কাছে আমায় রেখ। প্রভাত—ছেলেবেলা পড়েছ ত, 'মানীর অপমান বজ্রাঘাত তুল্য।' সব সইতে পারি—কিন্তু একটা ছোটলোক প্রজাও যখন বড় গলা করে বলবে—কেমন জব্দ! সে অপমান আমি সইতে পারবো না—তাহলে আমি বাঁচবো না। অর্থকে অর্থ বলে মনে করিনি—শুধু মান ও প্রতিপত্তির দিকে চেয়েছি; আমাকে অপমানের হাত থেকে বাঁচাও বাবা, তারপর যা খুসী তাই কর।" প্রভাত তাঁহার পিতার স্বভাব ভালরূপেই জানিত। তেজস্বী, অভিমানী, বিলাসী, অতিথিসেবক ও সদালাপি জমিদার তাঁহার পিতার ন্যায় সে অঞ্চলে অতি অল্পই আছেন। পিতার অশ্রু গদগদ কণ্ঠের কম্পিত স্বরে প্রভাতের প্রাণ গলিয়া গেল। সে পিতার

পদধূলি মাথায় লইয়া ভক্তি পুলকিত কণ্ঠে কহিল—'আমারও প্রতিজ্ঞা বাবা, আপনাকে ঋণমুক্ত করবো এবং পূর্ব্বের অক্ষুণ্ণ মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবোই করবো। আপনার যাতে লজ্জার কারণ ঘটে এমন কোন কাজ করবো না। রমণীবাবুর মুখে আনন্দের হাসি ফুটিয়া উঠিল।

৬

মধুপুরের ম্যাচখেলায় সুধীর পঞ্চাশের উপর রণ্ করিয়া বাঙ্গালী পক্ষের জিতিবার একমাত্র উপায় হওয়ায় গিরিডির সকল বাঙ্গালীরা যেমন আনন্দে মধুপুরের খেলার মাঠখানা জয়ধ্বনিতে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিল, তেমনি সাহেব খেলোয়াড়রাও এই তরুণ যুবকের খেলার কৌশল দেখিয়া যথেষ্ট ধন্যবাদে তাহাকে অভিনন্দিত করিতে ছাড়ে নাই।

গিরিডি যাইবার জন্য গাড়ী ধরিতে ষ্টেসনে আসিয়া দাঁড়াইবা মাত্রই কলিকাতা হইতে দিল্লী-যাত্রী একখানা গাড়ীও আসিয়া ষ্টেসনে দাঁড়াইল। সেদিন ষ্টেসনে মধুপুরের যত সব পুরুষ ও রমণীরা দলে দলে আসিয়া মিলিত হইয়াছিলেন। তাহাদের কাহারও হাতে ফুলের মালা, কাহারও হাতে খাবারের জিনিষ, কেহবা গরম টুপি, মোজা ইত্যাদি লইয়া যেন কিসের অপেক্ষা করিতেছিলেন। গাড়ী ষ্টেসনে আসিবা মাত্রই ষ্টেসনের সমুদয় লোক 'বন্দেমাতরম্' রবে চারিদিকে প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। কিসের যেন একটা উৎসাহের বন্যা সেই জনস্রোতের মধ্য দিয়া তড়িৎ বেগে প্রবাহিত হইয়া উপস্থিত জনসঙ্ঘকে একতার পুণ্যমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিল। সুধীর দেখিল—খাকির পোষাক পরা একদল বলিষ্ঠ বাঙ্গালী যুবক একখানা গাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিবা মাত্র সমবেত কণ্ঠে মাতৃমন্ত্র বন্দেমাতরম্ গান আরম্ভ হইয়া গেল :—

বন্দেমাতরম্

সুজলাং সুফলাং শস্যশ্যামলাং মাতরম্ !

* * *

সপ্তকোটি কণ্ঠ কলকল নিনাদ করালে,
দ্বিসপ্ত কোটি ভূজৈ-ধৃত খর করবালে,
কে বলে মা তুমি অবলে !

গীত শেষ হইলে একে একে সকলে সেই যুবকগণের গলায় মালা পরাইয়া দিলেন, কেহবা ঝুড়ি ঝুড়ি মিষ্টান্ন তাহাদের গাড়ীতে দিলেন, কোন কোন মহিলা নিজেদের হাতের তৈরী মোজা ও রুমাল প্রত্যেককে উপহার দিলেন। ঘণ্টা বাজিল,—আবার সকলে 'বন্দেমাতরম্' জয়ধ্বনি করিলেন—গাড়ী ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

সুধীর এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিতেছিল। একি এ অপূর্ব্ব দৃশ্য। তাহার দেহ ও মনের উপর দিয়া কি যেন এক নব শক্তির প্রেরণা জাগিয়া উঠিল। সুধীর কোন দিনই বাহিরের কোন সংবাদ রাখিত না, গিরিডি যাইবার পথে সে তাহার এক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিল—"ভাই এরা সব কোথায় গেল ?"

সে বিস্ময়ের সহিত কহিল—'কেন জানিস্‌নে, এরা সব বাঙ্গালী-সৈন্য যুদ্ধ করতে গেল, তাইতে এত 'বন্দেমাতরম্ গান।"

"হ্যাঁ ভাই, সবাইকে কি সৈন্য দলে নেয় ?"

"জানিস্ত আমরা বীরের জাতি। বাঙ্গালীদের বীরত্বে একদিন এই দেশ স্বাধীন ছিল। আমাদের দেশেই কেদার রায়, প্রতাপাদিত্য এরা সব বীরপুরুষ জন্মগ্রহণ করে মোগল-শক্তিকে প্রতিহত করেছিল। চিরদিন বাঙ্গালী লড়াই করেছে। ইতিহাসে বাঙ্গালী পল্টনের কত না বীরত্বের কাহিনী আছে। ইংরেজের আমলে বাঙ্গালীদের সৈন্যদলে ভর্ত্তী-করা

নিষেধ হয়। কিন্তু এইবার এই জার্ম্মেন যুদ্ধে আবার আমাদের বাঙ্গালী-দের সৈন্যদলে ভর্ত্তী করা সুরু হয়েছে। আগেও কয়েকদল বাঙ্গালী সৈন্য যুদ্ধ-ক্ষেত্রে গেছে, এই আর একদল গেল। তাই, আজ মধুপুরের সব লোক বাঙ্গালা সৈন্যদের অভ্যর্থনা করবার জন্য এখানে এসেছিলেন।"

সুধীর কহিল—"হ্যাঁ ভাই, আমি যদি সৈন্য দলে নাম লেখাতে চাই, আমায় নেবে ত?"

সুধীরের সঙ্গী আনন্দে লাফাইয়া কহিল—"আলবৎ নেবে—কেন নেবে না ভাই,—তুই যদি যাস্ তাহলে ছয় মাসের ভেতর একজন নাম-জাদা সুবাদার হতে পারবি—আমাদের গিরিডির মুখ উজ্জ্বল হবে।"

সুধীর কোন কথা কহিল না, কিন্তু তাহার প্রাণের নবীন উদ্দীপনার প্রফুল্ল দীপ্তি মুখে পরিস্ফুট হইয়াছিল। তাহার মন তখন কল্পনার এক রঙ্গিন নেশায় বিভোর হইয়া উঠিয়াছিল। সে দেখিতেছিল—সে যুদ্ধের বিস্তৃত ভূমিতে শত্রুর সম্মুখীন হইয়াছে—কামানের গর্জ্জন রবে চারিদিক প্রতিধ্বনিত,—শত শত রণে হত ও আহত সৈনিকের শোণিত ধারায় ধরণীর বক্ষ প্লাবিত। আর সে উন্মুক্ত তরবারি হস্তে অগ্রসর হইয়াছে—বিশ্বাসী আরবী তুরঙ্গম তাহাকে শত্রুর দলের মাঝখানে লইয়া ফেলিয়াছে; তরবারি ও বর্শার আঘাতে সে শত শত অরাতির ভীষণ আক্রমণ প্রতিহত করিয়া বীরদর্পে চলিয়াছে; রণজয়ের কি সে উৎকট আনন্দ—কি সে উন্মাদ উচ্ছ্বাস। আর এই শান্তিপূর্ণ অলস জীবন,—কোন কর্ম্ম নাই—কোন উৎসাহ নাই—শুধু সমালোচনা সহিয়া জীবন-পথে অগ্রসর হওয়া, সে কি হেয়—সে কি ঘৃণ্য!

সুধীরের এই স্তব্ধ নীরব ভাব দেখিয়া তাহার সঙ্গী চীৎকার করিয়া কহিল—'কি ভাবছিস্ সুধীর?'

সুধীর চমকিয়া কহিল—'হ্যাঁ ভাই, আমায় সৈন্য করে দিতে পারিস্?'

তাহার উৎসাহী বন্ধু আনন্দে চীৎকার করিয়া কহিল—'কেন পারব না?

'তবে তুই আমায় কালই ভর্ত্তী করে দেনা ভাই! ভর্ত্তী হ'তে হলে কি কলকাতা যেতে হয়?'

"দূর, কেন আমাদের গিরিডিতেই হয়। তুই জানিস্‌নে এখানেও যে সৈন্য সংগ্রহ করবার জন্য সভা হয়েছিল—একজনও সৈন্য হয়নি। কালই আমি বাবাকে বলবো, বাবাইত যে সভায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তার কাছেই সব শুনেছি। আচ্ছা, ভাই, তোর বাবা কি তোকে সৈন্য হ'তে ছেড়ে দিবেন। তুই যে সবে মাত্র এক ছেলে।"

সুধীর হাসিয়া কহিল—"আমার মত মূর্খ ছেলের বেঁচে থেকেই বা কি লাভ, তার চেয়ে সৈন্য হয়ে যদি মরি তবু মনে একটা প্রবোধ থাকবে যে আমি দেশের একটা কাজ করে মরেছি, আর যদি বেঁচে থাকি তা হলে বাবা এখন যেমন আমার ভবিষ্যৎ ভেবে অস্থির হচ্ছেন, তেমন অস্থির হবেন না, দেখ্‌লত কোন ক্ষতি নেই ভাই। হ্যাঁ যদি মা বেঁচে থাক্‌তেন, তা হলে হয়ত যেতে পারতুম না।" সুধীরের কথায় পরিষ্কার বুঝা যাইতেছিল যে সে বাহিরে কোন কথা প্রকাশ না করিলেও—অন্তরের মধ্যে বিশেষরূপেই তাহার নিরাশার বহু বেদনা পর্য্যাপ্ত পরিমাণেই পুঞ্জীভূত রহিয়াছে। পিতা তাহার ভবিষ্যৎ ভাবিয়াই ব্যাকুল—ভগ্নী তাহার মূর্খতার জন্য দুঃখিত। তাহার জীবনে সান্ত্বনা কোথায়? আশা কোথায়?

সুধীরের বন্ধু কহিল—'যদি যেতে পারিস্ তাহলে নিশ্চিত তুই সুনাম নিয়ে দেশে ফিরবি, তোর গৌরবে আমরা গৌরব অনুভব করবো। সংসারে যারা বড় হয়েছেন তাদের সকলকেই কোন না কোন বিপদের সম্মুখীন হ'তে হয়েছে। তোর মন যদি বলে এ ভাল কাজ—প্রাণে যদি মরণের ভয় না আসে তা হলে আর কিছু ভাবিস্‌নি, হয় জয় না হয় পরা-

জয়—হয় লাভ না হয় ক্ষতি, এ নিয়েই ত সংসার। লাভ লোকসানের খতিয়ান কসেও ত মানুষের লাভ হয় না।’

সুধীর উচ্চ হাস্য করিয়া বলিল—“আমি মরণের ভয় কি জানিনে। আজ বাড়ী গিয়েই বাবাকে সব কথা বল্‌বো। আমি ঠিক্ যাব। তুই তোর বাবাকে বলিস্।”

সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে গাড়ী আসিয়া গিরিডি পঁহুছিল। মহুয়া গাছে তখন ফুল ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে—পল্লিকার পথ ধরিয়া ষ্টেসন হইতে হাটিয়া বাড়ী পঁহুছিতে দণ্ড দুই রাত হইয়াছিল। কৃষ্ণ দ্বাদশীর চন্দ্রকর রেখা গাছ পালার ফাকে ফাকে ম্লান হাসি ফুটাইয়া দিতেছিল। চন্দ্রকান্ত বাবু তাহার শোবার ঘরে চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন,—প্রভা সেদিনকার দৈনিক কাগজের সংবাদগুলি তাহাকে পড়িয়া শুনাইতেছিল। বীণা বাহিরে বাগানের ধারে বেড়াইতেছিল—সুধীর বাড়ী ঢুকিতেই সে ছুটিয়া আসিয়া কহিল—‘এই যে ছোড়দা!’ বলি হেরে এলে না জিতলে?”

সুধীর বীণার পিঠে দুড়ুম করিয়া একটা কীল দিয়া কহিল—“হ্যাঁ, আমরা হারতে যাব কেন? কবে হেরেছি?”

“উঃ জিতেছ বলে, সে আনন্দেই বুঝি আমার পিঠে একটা কীল চালিয়ে দিলে, না?”

“দূর পাগ্‌লি—তুই আমরা হেরেছি একথা মনে কর্‌তে গেলি কেন?”

বীণা হাসিয়া কহিল—“উঃ তাই বাবু রেগে অস্থির! হ্যাঁ, ভাই, ছোড় দা, তুমি কত রণ করেছিলে?”

তোর কি মনে হয়! বীণা একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—“কত আর, চার পাঁচ—এই ঢের!”

সুধীর হো হো করিয়া হাসিয়া কহিল—“সকলের চেয়ে বেশী, পঞ্চাশ রণ করেছি। কেউ পারেনি রে কেউ পারেনি, সকলের উপর আমার দৌড়।”

বীণা আনন্দে সুধীরের হাত ধরিয়া একরূপ টানিয়া লইয়া পিতার ঘরে যাইয়া কহিল—"বা, কি মজা, শুনেছ বাবা, শুন্‌ছো দিদি, আজ ছোড়দা সকলের চেয়ে বেশী 'রণ' করেছে। কেউ তার সঙ্গে পেরে উঠেনি।"

চন্দ্রকান্তবাবু বিরক্তির সহিত কহিলেন—"এ করে পেট চল্‌বে কিনা!"

পিতার এই উক্তিতে সুধীরের মুখ ছাইয়ের মত সাদা হইয়া গেল। বিজয়ের উৎসাহে যে আনন্দ তাহাকে এতক্ষণ প্রফুল্ল রাখিয়াছিল—তারপর সৈন্যদলে যোগ দেওয়ায় যে অদম্য আবেগ তাহাকে বাহিরের দিকে টানিয়া আনিতেছিল কিন্তু বৃদ্ধ পিতার ও স্নেহময়ী ভগিনীগণকে ছাড়িয়া যাইতে যে বেদনার আশঙ্কায় তাহার চিত্ত আন্দোলিত হইতেছিল; পিতার এই নিরুৎসাহ বাণীতে সব যেন এক নিমিষে কোথায় চলিয়া গেল! তাহার মনে একটা দারুণ ধিক্কার জাগিয়া উঠিল! ছিঃ ছিঃ তাহার মত অকর্ম্মণ্য মূর্খ অপদার্থ পুত্রের জীবন, এমন কি পিতার কাছে পর্য্যন্ত তুচ্ছ। তবে—কোথায় তাহার স্থান? সুধীর কোন কথা কহিল না—নীরবে একখানা চৌকির উপর চুপ করিয়া বসিয়া পড়িল।

বীণা সুধীরকে খুব ভালবাসিত—পিতার এই কথায় তাহার প্রাণেও কি যেন কেমন একটা বেদনা জাগিয়া উঠিল,—সে কহিল—"বাবা, তুমি কেন ছোড়দাকে গাল দিলে? কতকগুলো বইর পড়া মুখস্থ ক'রলেই বুঝি সে একজন মানুষ হয়, আর যারা ছোড়দার মত ভাল খেলোয়াড়—তাদের বুঝি কোন সম্মান, কোন আদর নেই? তবে রণজিৎ সিংএর ক্রিকেট খেলার জন্য এত গৌরব কেন?"

চন্দ্রকান্তবাবু ব্যঙ্গের স্বরে কহিলেন—"তোর ছোড়দাও কি একজন রণজিৎ সিং নাকি?"

বীণা নির্ভীক ভাবে কহিলেন—"হ'তে পারেন, বিচিত্র কি?"

প্রভা এতক্ষণ পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল. এইবার বীণাকে সম্বোধন করিয়া কহিল—"বীণা তুই এতদূর অপদার্থ হয়েছিস্ যে বাবাকে যা মুখে আসছে তাই বল্‌ছিস্, লজ্জা করেনা তোর।" বীণা তাহার বাবাকে যত না ভয় করিত—দিদিকে তার চেয়ে ঢের বেশী ভয় করিত; প্রভার তীব্র চাহনি ও ভৎসনা বাক্যে সে ব্যথিত কণ্ঠে কহিল—"তোমরা কেবলি ছোড়দা বেচারীকে গাল দেবে, তা আমি সইব না, কখ্‌খনো সইবনা বলে দিচ্ছি, আমাকে তোমরা যতই বকনা কেন।" এই কথা বলিয়া সে দ্রুতপদে ঘর হইতে চলিয়া গেল। প্রভা আর কোন কথা কহিল না—কিংবা বীণাকে ফিরিয়া ডাকিল না। অভিমানিনী বীণা ব্যথিত প্রাণে চলিয়া গেল।

বীণা চলিয়া গেলে, প্রভা সুধীরকে কহিল—"সুধীর চা খেয়েচ?"

সুধীর কোন উত্তর করিল না। চন্দ্রকান্তবাবু কহিলেন—"সংসারে সন্তানের মঙ্গল চিন্তা পিতামাতা যত বেশী করেন, আর কেউ তা করে না। তোমার ভাল মন্দ, দোষ গুণ আমার কাছে যত প্রিয় ও অপ্রিয় তেমন আর কারো কাছে নয়। তুমি এখন শ্রান্ত হয়েছ, বিশ্রাম কর। কাল আমি তোমার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে গুটিকতক কথা বলব।"

সুধীর কহিল—"বাবা, আমি কতদূর অপদার্থ, সে আমি জানি। আমি ইউনিভারসিটির একটা সামান্য পরীক্ষাও পাশ কর্‌তে পার্‌লুম না, এ বয়স পর্য্যন্ত খেলাধূলা করেই কাটিয়ে দিয়েছি। আমি জানি, আমি কোন কাজেরই যোগ্য নই;—তবে ঈশ্বর কোন মানুষকেই একেবারে সব বিষয়ে অপদার্থ করে সৃষ্টি করেন না,—আমিও আমার কর্ত্তব্য স্থির করেছি।"

চন্দ্রকান্তবাবু বিস্মিত হইয়া কহিলেন—"কি কর্ত্তব্য স্থির কর্‌লে?"

সুধীর তেজঃদৃপ্ত কণ্ঠে কহিল—"আমি সৈন্য হব।"

প্রভা ও চন্দ্রকান্তবাবু পরস্পরে পরস্পরের মুখের দিকে কিয়ৎকাল নীরবে চাহিয়া রহিলেন। প্রভা কহিল—"সুধীর, সৈন্যদলে নাম লিখিয়ে কি আমাদের ভয় দেখাতে চাও নাকি?" প্রভা কোন দিনই এই অযোগ্য ভাইটীকে প্রসন্ন চক্ষে দেখিতে পারে নাই। সে ভাবিয়াছিল যে পিতার ভৎর্সনায় সুধীর একটা আতঙ্কের ভাব দেখাইয়া স্নেহের উদ্রেক করিতে চেষ্টা করিতেছে।

সুধীর হাসিয়া কহিল—"দিদি! তুমি আমায় অতবড় অপদার্থ, কাপুরুষ মনে করোনা। তুমি স্ত্রীলোক হয়েও এম্, এ পাশ দিয়েছ, আর আমি পুরুষ হয়েও দু'খানা বই কণ্ঠস্থ করে পরীক্ষা পাশ করবার বিদ্যা লাভ করতে পারলুম না। কিন্তু গায়ের জোর বিধাতা আমাকে প্রচুর রূপেই দিয়েছেন। যুদ্ধে যাই, লড়াই শিখি, যদি বাঁচি হয়ত তোমাদের মুখ উজ্জ্বল হ'বে, নতুবা মরে গেলে, কোন ক্ষোভ—কোন দুঃখ নেই, যে অপদার্থ তার সংসারে বেঁচেই বা কি লাভ?"

প্রভা কহিল—"কই, এতদিনত তোমার মুখে একথা শুনিনি। আজ কে তোমায় এ বুদ্ধি দিলে?"

সুধীর হাসিয়া কহিল—"যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনিই দিলেন। পথ পাচ্ছিলাম না, পথ দেখিয়ে দিলেন। অন্ধকারে হাতড়াচ্ছিলুম—আলোর রেখা দেখ্‌তে পেয়েছি—ব্যস্!"

চন্দ্রকান্তবাবু ধীরে কোমল কণ্ঠে কহিলেন—"প্রভা! সুধীরকে খাবার দাওগে,—এসব কথা কালও ত হ'তে পারবে।"

সুধীর কহিল—"বাবা! আমি আমার মন বেঁধেছি, তুমি আমায় মানা করোনা বাবা।"

প্রভা কহিল—"এটাই কি তুমি খুব বড় কর্ত্তব্য বলে, মনে করলে?"

সুধীর কহিল—"আমি বিদ্বান্ নই যে তোমার সঙ্গে কর্ত্তব্যের বিচার

কর্‌বো। মূর্খ, গোঁয়ার, জীবনের মায়া যাদের নাই, তারা ছাড়া কি কেউ সৈন্য হ'তে পারে দিদি ?"

সেদিন এইরূপ আরও খানিকক্ষণ তর্ক-বিতর্ক চলিল। সপ্তাহ চলিয়া গেল, চন্দ্রকান্তবাবু বা প্রভা কাহারও কোন কথায়ই কোন ফল হইল না। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সুধীর সত্য সত্যই বাঙ্গালী পল্টনে যোগ দিল। গিরিডি হইতে যে দিন কলিকাতা চলিয়া গেল, সেদিন সেখানকার সকলে মিলিয়া তাহার গলায় মালা পরাইয়া 'বন্দে মাতরম্' গান গাহিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিল।

বীণা কাঁদিয়া কাঁদিয়া শয্যা লইল। চন্দ্রকান্তবাবুর চোখ হইতে এক ফোঁটা জলও পড়িল না। সুধীর যখন যাত্রাকালে বিদায় লইবার জন্য পিতার কাছে আসিল, তখন তিনি সুধীরের মাথায় হাত বুলাইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন—"বীরত্বের আদর্শ হও, চরিত্রে সুযশ লাভ কর। যদি বাঁচি আবার দেখা হবে।"

চন্দ্রকান্তবাবুর এই দৃঢ়তা দেখিতে পাইয়া সকলেই তাহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন।

সুধীরের জীবনের লক্ষ্য স্থির হইল—সে যে কল্পনায় মধুর চিত্রে বিভোর হইয়াছিল, এতদিনে তাহা পূর্ণ হইতে চলিল।

৭

মধুমতী নদীর ধারে রামপুর গ্রাম। গ্রামখানি ছোট। গ্রামে শুধু জমিদার বাবুর বাড়ী, আর দশ বার ঘর ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ ভদ্রলোকের বাস। মধুমতীর আর পূর্ব্বের সেই শোভা নাই, মুখ বুজিয়া গিয়াছে, কাজেই স্রোতধারা আসা যাওয়া করে না। নদীর মুখ বন্ধ হওয়ায় ঐ অঞ্চলের গ্রামগুলির স্বাস্থ্য খারাপ হইয়া গিয়াছে। রমণীবাবুর বাড়ী এই রামপুর গ্রামে। প্রকাণ্ড বাড়ী। বাড়ীর সম্মুখে খোলা মাঠ, মাঠের

মাঝখান দিয়া পাকা বাঁধান রাস্তা নদীর তীর পর্য্যন্ত গিয়াছে। নদীর স্রোত নাই, কাজেই ভাঙ্গার ভয় নাই। মাঠের পরেই প্রাচীর ঘেরা জমিদার বাড়ী। সিংহদরজার উপরের চূড়াটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, প্রাচীরের ও নানাস্থান ভাঙ্গিয়া ধসিয়া গিয়াছে, সে সব স্থানে নানা আগাছা জন্মিয়া অন্ধকার করিয়া আছে। সিংহদরজার পর—পথের তুই ধারে বাগান, বাগান এক সময়ে যে বেশ সুন্দর ছিল, তা এখনও বুঝিতে পারা যায়। ভিনাসের মার্ব্বেল প্রস্তর গঠিত মূর্ত্তিটির হাত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, গোলাপ গাছের ডালাগুলি যত্নের অভাবে চারিদিকে লতাইয়া পড়িয়াছে। বুনো ঘাস এমনি করিয়া মাথা তুলিয়াছে যে বাগানে প্রবেশ করা অসাধ্য। বাগানের পরেই অন্দরের উচ্চ প্রাচীর আরম্ভ হইয়াছে, বাহির হইতেই ভিতরের উচ্চ ত্রিতল অট্টালিকা দেখা যায়। অন্দরে ঢুকিবার পথের তুই পাশে দেউড়ি ঘর, কাচারী ঘর ও লোকজন, চাকর বাকরদের থাকিবার ঘর। নদীর ধারের সুন্দর বাঙ্গলাটি এখনও পূর্ব্বের ন্যায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আছে, বাঙ্গলার সম্মুখের বাগানটিও প্রত্যহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়; সেখানকার ফুলবাগানে অজস্র ফুল ফুটিয়া আছে। সাহেব সুবোর দল প্রায়ই এ অঞ্চলে আসেন বলিয়া বাঙ্গলাটির প্রতি যত্ন আছে। যতদিন রমণীবাবুর শক্তি সামর্থ্য ছিল, ততদিন বাড়ীর শোভা সমৃদ্ধিও ছিল। বাড়ীর সাজ সজ্জা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য যখন তাঁহার সর্ব্বদা মনোযোগ ছিল, এখন আর কে এই ব্যয় বহন করিবে?

বৈশাখ মাস। ভোরের বেলা জমিদারের কাচারী ঘরে আমলাবৃন্দ নিজ মনে কাজ করিতেছে, কেহবা ঘণ্টাখানেক শুধু ভক্তিভরে দুর্গানাম লিখিতেছে। কেহবা কলম চালাইবার সঙ্গে সঙ্গে আজকালকার পলিটিক্স লইয়া তর্ক আরম্ভ করিয়াছে। পেয়াদার দল ঘন ঘন তামাক লাগাইয়া

জরবাণ হইয়া যাইতেছে। ম্যানেজার মহিমচন্দ্র ঘোষ তখনও কাছারীতে আসেন নাই। জমিদার বাড়ীতেই তাঁহার বাসা। তিনি সপরিবারে থাকেন, ময়মনসিংহ জেলার লোক। এক স্ত্রী ব্যতীত সন্তান-সন্ততি কিছুই নাই। লোকটী দেখিতে বেঁটে, স্থূলকায়, মুখখানা গোলগাল, চক্ষু দুইটী বৃহৎ ও রক্তবর্ণ,—গ্রামের কাহারো সহিত তিনি মিশিতেন না, কারণ ঐরূপ মেশামিশি করিলে যদি কাহারও সহিত আত্মীয়তা হয় তাহা হইলে কর্ত্তব্য সাধনে বহু ত্রুটি ঘটিতে পারে এবং মনিবের কার্য্যের ক্ষতি হইবার সম্ভব। প্রজাদিগকে কঠোর শাসন করিবার খ্যাতিতে ম্যানেজার বাবুকে সকলেই ভয় করিত।

একটু বেলা হইতেই ম্যানেজার বাবু কাছারীতে পদার্পণ করিলেন। যে সকল নায়েব ও মুহুরীগণ এতক্ষণ দুর্গানাম লিখিয়া ও পলিটিক্সের চর্চ্চা করিয়া সময় নষ্ট করিতেছিলেন—হঠাৎ তাহারা হিসাব পত্র লইয়া অত্যধিক মনোযোগী হইয়া পড়িলেন। পেয়াদা বরকন্দাজ-নায়েব মুহুরী সকলের নমস্কার ও সেলাম কুড়াইয়া লইয়া ম্যানেজার বাবু বসিবার ঘরে যাইয়া আসন গ্রহণ করার অল্প সময় পরেই একজন পেয়াদা ডাকের চিঠি লইয়া হাজির করিল। মহিমবাবু একে একে সব চিঠিগুলি পড়িয়া প্রত্যেকটীর উপর যথারীতি আদেশ লিখিয়া ভিন্ন ভিন্ন সেরেস্তায় পাঠাইয়া দিয়া—পরে কলিকাতার মোহরাঙ্কিত চিঠিখানা খুলিলেন।

চিঠি পড়িয়াই তাহার চক্ষু স্থির হইল। চিঠিতে লেখা ছিল—"শ্রীমান্ প্রভাত জমিদারীর কার্য্য-প্রণালী ও হিসাব নিকাশ ইত্যাদি পরীক্ষার জন্য আগামী ৫ই বৈশাখে বাড়া মোকামে যাইতেছে, আপনি তাহার থাকিবার সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা বিধান করিয়া হিসাব নিকাশ ইত্যাদি বুঝাইয়া দিবেন এবং মহালের সমুদয় প্রজাগণকে তলব দিয়া শ্রীমানের সহিত সাক্ষাতের ও পরিচয়ের ব্যবস্থা করিবেন। শ্রীমান্ দীর্ঘকাল দেশ-

ছাড়া, কাজেই তাহার চলাফেরা থাকা খাওয়া দাওয়া প্রভৃতির কোন বিষয়ই যাহাতে কোনরূপ অসুবিধা না হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবেন। আমি শারীরিক সুস্থ নহি, আশা করি মহাশয় কুশলে আছেন।

আশীর্ব্বাদক—শ্রীরমণীমোহন বসু চৌধুরী।

মহিমবাবু চিঠিখানি পড়িয়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। কেন এই সময়ে জমিদার পুত্র হিসাব নিকাশ ইত্যাদি পরিদর্শন করিতে আসিতেছে তাহার কারণ সে ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। হিসাব নিকাশের মূলে যে কত গলদ রহিয়াছে, তাহার ত কোন ঠিক্ ঠিকানাই নাই। প্রভাত—এখন শিক্ষিত ও সুদক্ষ বিলাত ফেরত, তাহার পক্ষে এ সব জমিদারী হিসাব নিকাশ বুঝ প্রবোধ করিয়া লওয়া কি খুবই সহজ হইবে। এইরূপ নানা চিন্তায় তাহার মন নানা অশান্তির দোলনায় দুলিতে লাগিল। অন্তরের এ সকল গোপন ভাব বাহিরে প্রকাশ না করিয়া, স্বয়ং হাসিমুখে চিঠিখানা সহ আমলাগণের সমক্ষে যাইয়া উপস্থিত হইয়া সকলকে চিঠির সমাচার জ্ঞাত করিলেন। এ সংবাদে দু'একজন মুহুরী ছাড়া সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।

গোপাল সান্যাল নামে একজন প্রবীণ মুহুরী ছিলেন,—বাক্‌পটুতায় তাহার অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল—উচিতবক্তা বলিয়া তাহার একটু খ্যাতিও ছিল, কাহাকেও উচিত কথা শুনাইয়া দিতে তাহার বিন্দুমাত্রও শঙ্কা হইত না। সান্যাল মহাশয় হাতের কলমটা কাণে গুঁজিয়া কহিলেন—"ম্যানেজার বাবু! তা'হলে ত আর তিন চারিদিনের মধ্যেই কুমার বাহাদুর বাড়ী এসে পৌছবেন; আজ থেকেই পরগণায় পরগণায় চিঠি বিলি করে দিই—আর বাড়ী ঘর দোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করবার একটা বিলি ব্যবস্থা করি।"

মহিমবাবু সান্যাল মহাশয়কে আদৌ পছন্দ করিতেন না। তিনি বিরক্তভাবে কহিলেন—"হ্যাঁ, একেবারে প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ আসছেন কিনা ?"

সান্যাল কহিলেন—'নিশ্চয় মশাই! আমাদের প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ত নিশ্চয়ই। আপনি শ তিনেক টাকা মঞ্জুর করুন—কাজে লেগে যাই।'

মহিমবাবু পূর্ব্বের ন্যায় ভ্রুভঙ্গী করিয়া কহিলেন—"নৌকা ভরাডুবি আর পাল তুলে কাজ নেই। হিসেব নিকেশ তৈরী করুন। দিনরাত খেটে যার যার কাগজ পত্র প্রস্তুত করুন, বাজে বকে লাভ নেই।"

সান্যালও ছাড়িবার পাত্র নহে—সে পুনরায় কহিল—"সে হয়না ম্যানেজার বাবু, আমরা দশজনে চাঁদা করে করবো।"

'ইস আপনি যে বড় রাজভক্ত প্রজা দেখ্তে পাই ?'

"যার নুন খাই তার কি গুণ গাইব না ?" কৌশলি ম্যানেজার বাবু তর্ক আর বেশী দূর অগ্রসর হওয়া সঙ্গত মনে না করিয়া কহিলেন—বেশত, যা ভাল বুঝ্ছেন করুন,—আমি কতকগুলো বাজি পোড়ানো আর গেইট সাজাবার জন্য তিনশো টাকা মঞ্জুর কর্তে রাজি নই। আমি চিরদিন মনিবের কল্যাণ চিন্তা করে এসেছি, তাই করবো।"

গোপালবাবু আর কোন কথা বলিলেন না। সেরেস্তায় বসিয়া কাজ করিতে মন দিলেন। মহিমবাবুর দৃষ্টি এড়াইয়া সকল আমলাদের মধ্যে যে একটা ঈষারা ইঙ্গিত চলিয়া গেল, তাহা বাহিরের কেহই বুঝিতে পারিলেন না।

ম্যানেজার বাবু কহিলেন—"কুমার বাহাদুর বাড়ী এসে পঁহুছিলে পর, প্রজাদের তলব দেওয়া যাবে, মনে করুন, যদি তিনি এসে পৌছতে না পারেন, তাহলে কে এতগুলো লোককে থাকবার খাবার ব্যবস্থা করে দেবে ?"

একজন মুহুরী কহিল—"কেন বরাবর যে ভাবে থাকে এবারেও সেই ভাবে থাক্‌বে, কই কোনদিন ত তাদের থাক্‌বার কষ্ট বা স্থানের অভাব হয় নাই, পুণ্যাহের সময়ও ত লোক কম হয় না।"

"আপনাদের সঙ্গে তর্ক করা আমার ইচ্ছা নয়।" এই কথা বলিয়া মহিমবাবু—বাসার দিকে চলিয়া গেলেন। তাহার মুখে গভীর চিন্তার রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

তাহার প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই—সকলের হাতের কলম কানে উঠিল। ফর্সাপানা, বেটে গোচের চেহারা, কুমুদিনী দে নামক একজন মুহুরী—বলিয়া উঠিল—"ম্যানেজার বাবুত কথাটা ঠিক্‌ই বলেছেন, কেন বাপু হাঙ্গামা পোয়ান। দু'দিন বাদেত জমিদারী দশজনের হাতে যাবে, আমাদের আর মানবকে ভক্তি শ্রদ্ধা দেখিয়ে কি লাভ? যার যার কাজ গুছিয়ে নাও, আর বেশীদিন এখানে হাঁড়ী চড়বে না।"

কুমুদিনীর মুখের কথায় কেহই তেমন বিস্ময় প্রকাশ করিল না, কিংবা উত্তর প্রত্যুত্তর দিল না। ইহার একটু কারণও ছিল। কুমুদিনী বহুদিন যাবত জমিদারী ষ্টেটে কাজ করিয়া আসিতেছে, লোকটা ধূর্ত্তের শিরোমণি। মহিমবাবু ইহার কথাতেই উঠা বসা করেন। কুমুদিনী যে শুধু ধূর্ত্ত তাহা নহে, তাহার অসাধ্য কর্ম্ম কিছুই ছিলনা, জাল করিতে, মিথ্যা মাম্‌লা সাজাইতে সে ছিল অদ্বিতীয়। জেলার বড় উকীল জেরা করিয়া তাহাকে ঠকাইতে পারে নাই : সে কোন একটা গোলমাল না করিয়া থাকিতে পারিত না। এদিকে নেশা ভাঙটাও তাহার চলত। চরিত্রও তাহার সুবিধাজনক ছিলনা—স্ত্রীর মৃত্যুর পর হইতে সে হরিদাসী বৈষ্ণবীর সঙ্গে স্বামী স্ত্রীর ন্যায় বাস করিত। নানারূপ ছল প্রবঞ্চনা করিয়া যাহারা চলে, সাধারণতঃ দেখা যায় যে তাহারা টাকা-কড়ি তেমন সঞ্চয় করিতে পারে না, কুমুদিনী সে বিষয়ে যথেষ্ট শেয়ানা ছিল। সে সর্ব্বদাই

বলিত যে সময় চিরদিন সমান থাকে না,—আজ দু'টো পয়সা পাচ্ছি, কিন্তু এ সময়ে যদি কিছু গুছিয়ে না রাখ্‌তে পারি, তাহলে শেষটায় দুঃসময়ে পড়লে কেউ কাছে দাঁড়াবে না। কুমুদিনীর বয়স চাল্লিশের কিছু উপর, কথাবার্ত্তা চাল চলনে তাহাকে অতি সরল শান্ত ভদ্রলোক বলিয়া মনে হইত—বাহিরে সহসা কেহ বুঝিতে পারিত না যে লোকটার মনের ভেতর দিবারাত্রি সাপের কুণ্ডলী চলিতেছে। তাহাকে সকলেই ভয় করিয়া চলিত—কারণ সে ম্যানেজারের প্রিয়পাত্র ছিল। ম্যানেজার "পান খাওয়ার" বাবদ প্রজাগণের নিকট হইতে যাহা গ্রহণ করিতেন তাহা সকলই কুমুদিনীর হাত ঘুরিয়া আসিত। কুমুদিনী কাহারও সহিত একশত টাকায় রফা করিলে, ম্যানেজার পাইতেন পঁচিশ—আর কুমুদিনীর পকেটে উঠিত বাকী পঁচাত্তর। কাজেই এক কথায়—কুমুদিনীর হাতেই ম্যানেজার চলাফেরা করিতেন বলিয়া অন্যান্য আম্‌লা মুহুরীরা তাহাকে একটু সমীহ করিয়া কথাবার্ত্তা বলিত। কি জানি কাহার বিরুদ্ধে ম্যানেজারের কাছে কোন্ কথা বলিয়া চাকরীটি ছাড়ায়! গ্রামের লোকেরা, কাচারীর কর্ম্মচারীরা বহুদিন পরে জমিদারের একমাত্র সুশিক্ষিত সন্তান দেশে আসিতেছেন বলিয়া আদর অভ্যর্থনার যে আশা করিয়াছিল তাহার যখন কিছুই হইল না, তখন সকলেই দুঃখিত হইল। তবে গ্রামের সকলেই জানিল যে জমিদার-পুত্র ফিরিতেছেন।

সন্ধ্যার সময় কুমুদিনীকে ডাকাইয়া আনিয়া ম্যানেজার কহিলেন—"বুঝ্‌লে হে কুমুদিনী! এবার ব্যাপারটা বড় গুরুতর দাঁড়াবে। এ লেখাপড়া জানা সাহেব লোক—জানি না অদৃষ্টে কি আছে। খাতা পত্রগুলো ঠিক্ রেখেছ ত? আর কাল একবার মফস্বলে গিয়ে মহাজনদের বলে কয়ে ঠিক্ করে ফেল। নিকেশ চাইলে কি যে করা যাবে—ভেবে ঠাহর পাচ্ছিনে।"

কুমুদিনী হাসিয়া কহিল—"আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুন। নিকাশ দেখতে চাইলে আমায় কাগজ পত্র দাখিল করতে বলে দেবেন—যা হয় করবো। সব শালা এক জোট—এখন আপনাতে আর আমাতে মিলে মিশে বুদ্ধি পরামর্শ করে যদি এ দায় থেকে উদ্ধার হ'তে না পারি—তা হলে সব শালারা যে টিটকারী দিবে। আমি খুব ভেবেছি।"

"তবে—এতটা কি সামলাতে পারবে?"

"আহা! রামচন্দ্র! আপনি কোন কথা কইবেন না, সব ঠিক করে দোব। তা হুজুর, বোতলটায় কি একটু আছে?"

ম্যানেজার হাসিয়া বলিলেন—"হাঁ, তোমার জন্য কাল জেলা থেকে একটা পাঁইট আনিয়ে রেখেছিলুম।"

কুমুদিনী ম্যানেজারের পায়ে মাথা ছোঁয়াইয়া কহিল—"সাধে আমি আপনার গোলাম!"

"কি কর কুমুদিনী?"

"আজ্ঞে আপনিইত আমার বাপ মা ভাই বোন্ সব। পায়ের ধুলো নেব না? কুমুদিনী বেশ মনের মত করিয়া নেশা করিল—তারপর রাত্রি প্রায় বারোটার সময় হরিদাসী বৈষ্ণবীর ঘরের দিকে চলিল।

৮

সুধীর করাচীতে কিছুদিন লড়াই শিক্ষার কসরত করিয়া মেসোপটেমিয়ায় তুর্কীদের সহিত লড়াই করিতে চলিয়া গিয়াছে। চন্দ্রকান্তবাবুর বাহিক ব্যবহারে কোনরূপ অধৈর্য্যের লক্ষণ প্রকাশ না পাইলেও অন্তর-মধ্যে যে একটা বিষাদের করুণ ঝড় উতলাভাবে বহিতেছিল, তাহার বহু লক্ষণই সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। সুধীর বীণার কাছে মাঝে মাঝে দুই একখানা চিঠি দিয়া তাহার নূতন জীবনের খবর দেয়।

—বীণা পরীক্ষা দিয়া এখন গিরিডি ফিরিয়াছে। প্রভা মনে মনে সুধীরের জন্য একটা অনুতাপ বোধ করিতেছিল—'কেন সে গেল? তবে কি তাহার কথাতেই সে মর্ম্মাহত হইয়া নিশ্চিত মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইল? যদি সে না ফিরে? যদি সুদূর অজ্ঞাত দেশেই তাহার জীবন-লীলা শেষ হয়, তাহা হইলে সে যে তাহাদের পক্ষে কত বড় গুরুতর আঘাত হইবে!'

বৈশাখের শেষ ভাগ। পশ্চিমের সর্ব্বত্রই দারুণ গ্রীষ্ম। সারা দিনের তপ্ত সূর্য্য কিরণের দারুণ দহনের পর রাত্রিতে প্রকৃতির শান্ত শীতল ভাব পরম রমণীয়। অর্থাভাবের দারুণ চিন্তা চন্দ্রকান্তবাবুকে দিন দিনই জীর্ণশীর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল, তাঁহার স্বভাবও অতি মাত্রায় খিট্‌খিটে হইয়া পড়িয়াছিল। পূর্ব্বের ন্যায় কাহারও কোন কথাই আর তেমন শান্তভাবে গ্রহণ করিতে পারিতেন না। তারপর ক্রমাগত কতকগুলি কোম্পানীর ফেইল পড়ার সংবাদে তিনি কিছুতেই আর নিজেকে সামলাইয়া লইতে পারিতেছিলেন না। সকলের অজ্ঞাতে বারবার শেষ বারের পরীক্ষা বলিয়া যতীন চৌধুরীর মারফতে তিনি কতকগুলি কোল সেয়ার কিনিয়া ফেলিয়াছেন, তাহার টাকার পরিমাণও পাঁচ হাজার টাকার কম নহে,—কাজেই কন্যাদের যৌতুক দেওয়ার মত যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাহা সকলই নিজের হাতের মুটির বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। এ কথা প্রভাকে অনেক দিন যাবত বলি বলি করিয়াও বলিতে পারেন নাই। ঘরের বারান্দায় 'ইজি চেয়ারের' উপর শরীর এলাইয়া দিয়া পথের দিকে চাহিয়া কহিলেন—"উঃ আজ কি গরমটাই না পড়েছিল, কিন্তু এখন এই মিষ্টি হাওয়াটা বেশ লাগছে। বীণা কোথায় প্রভা?"

প্রভা হাসিয়া কহিল—"বীণা, গান মুখস্থ কচ্ছে?"

"কিসের গান?"

"কি যেন একটা হিন্দুস্থানী গানের সুর কল্‌কাতা থেকে শিখে এসেছে, তারি কস্‌রত হচ্চে।"

চন্দ্রকান্তবাবু মৃদু হাসিয়া কহিলেন—"সুধীর চলে যাওয়ায় ওর প্রাণে বড় আঘাত লেগেছে। দু'জনে এক সঙ্গে ছুটোছুটি দৌড়াদৌড় করত কি না?"

"হাঁ, বাবা, তুমি কি সুধীরের অভাবটা খুব বেশী করে অনুভব কচ্ছো?"

চন্দ্রকান্তবাবু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—"মা বড়া দুরন্ত ছেলে, কত কষ্ট করে ওঁকে মানুষ করেছি, তাই কেমন যেন একটা দুর্ভাবনা আর—না বলে কাজ নেই, ভীরুতা ও দুর্ব্বলতা মন থেকে দূর করে দেওয়াইত ভাল।"

"বাবা, ভগবান্ কোন্ মানুষকে কোন্ পথ দিয়ে টেনে নিয়ে মহৎ করে তোলে, সে কথা কেউ বলতে পারে না। দুর্দ্দান্ত গোঁয়ার ক্লাইভ যে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনের মূল হবেন, সে কি সে-দেশের লোকেরা কল্পনাও কর্‌তে পেরেছিলেন? আমাদের সুধীরও যে তেমন বড় কাজ করে ফিরবেনা সে কথা কে বলবে বলুন?"

"হাঁ, তবে কি জানিস্ মা, সন্তানের জন্য বাপ মায়ের প্রাণ যে কেমন করে ওঠে, সামান্য অসুখ দেখেও বুকের ভিতরে কি যে আশা নিরাশার দোলনা দোলে, সে কি করে বুঝাই বল।" কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া পুনরায় কহিলেন "এ কথাও ঠিক্ মা, মানুষের মৃত্যু যখন একটা নিশ্চিত ব্যাপার, তখন ভীরু কাপুরুষের মত মরার চেয়ে মানুষের মত মরাই ভাল। তারপর ব্যক্তি সমষ্টি নিয়েই ত সমাজ; প্রত্যেক ব্যক্তিই যদি আপনার সন্তানটিকে আগ্‌লে রাখে—ঝড়ের বুকে ছেড়ে না দেয় তাহলে, কি করে জাতি গড়ে উঠ্‌বে? তোমার কথাই ঠিক্ মা, ভগ-

বান যে প্রেরণায় তাকে টেনে নিয়েছে, বোধ হয় তাই ওঁর জীবনের পক্ষে মঙ্গল। আমার ত সুধু ভাবনাই সার—যিনি পৃথিবীর সকলের ভাবনা ভাব্‌ছেন, তিনিই ওঁর ভাবনা ভাববেন, তবে কি জানিস্‌ মা, মানুষ আমরা, বড় দুর্ব্বল, তাই ভেবে ভেবে সারা হই, মনকে সবল করে তুল্‌তে পারি না।"

বৈশাখী পঞ্চমীর চন্দ্র প্রচুর আলো ঢালিয়া দিতেছিল,—মহুয়া-ফুলের উগ্রগন্ধ তীব্রভাবে বাতাসে ছড়াইয়া দিতেছিল,—কয়েকটা বড় বড় শালতরু মৃদু পবনে ঘন ঘন আন্দোলিত হইতেছিল। প্রভা বাহিরের এই মধুর সৌন্দর্য্য নয়ন ভরিয়া পান করিতেছিল। সহসা কি ভাবিয়া সে মাথাটা একটু নীচু করিয়া সলজ্জ ভঙ্গীতে কহিল—"বাবা! তোমায় একটা কথা বল্‌তে চাই?"

চন্দ্রকান্তবাবু তন্ময় হইয়া কি যেন ভাবিতেছিলেন—হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া কহিলেন "কি কথা মা?"

"কেন বাবা তুমি সেদিন যতীনবাবুকে আমাদেব বাড়ীতে ঢুক্‌তে দিলে?"

"ভাল কথা মনে করেছ মা, আমিও তার প্রতি প্রথমে খুবই দুর্ব্যবহার করেছিলুম, কিন্তু শেষটায় মনে হল, ছোক্‌রাটা খুব খারাপ নয়?"

প্রভা ক্রুদ্ধস্বরে কহিল—"খারাপ নয়? যে তোমার মেয়ের সঙ্গে কুৎসিৎভাবে কথা কইতে পারে, তাকে কোন হিসাবে আবার প্রশ্রয় দেওয়া যেতে পারে?"

"কি ঘটনা হয়েছিল, আমিত সব কথা জানিনে মা,—তুমি নিঃসঙ্কোচে আমায় বল্‌তে পার, সে একটা অন্যায় করেছিল, তাই শুনেছি—কিন্তু সব কথাত আমার শোনা হয়নি।"

প্রভা কহিল, "তবে শোন বাবা! মাঘোৎসবের শেষ দিন আমি

সমানে গান গেয়েছিলুম,—গান গাওয়ার পর আচার্য্য মশাই আমাকে একছড়া ফুলের মালা গলায় পরিয়ে দেন,—তাঁর দেখাদেখি আরও মেয়েদের মধ্যে কেহ কেহ ওরূপ করেছিলেন। আমি উপাসনার পর বেব হচ্ছি এমন সময় সে হঠাৎ এসে আমার হাত চেপে ধরে বল্লে—"আজ তুমি ত খুব ফুলের মালা পেয়েছ! আমায় এক ছড়া দেবে?" আমি মনে করেছিলুম—সুধীর, কিন্তু শেষটায় দেখ্‌লাম,এই অপদার্থ; আমি চীৎকার করে উঠ্‌লুম—সে চলে গেল! চারিদিক্ থেকে সকলে যখন ছুটে এসে জিজ্ঞেস কর্‌লো কি হয়েছিল? তখন সব কথা বল্‌লুম বটে, কিন্তু কেউ কেউ দু'হাত দূরে সরে গিয়েই চাপা গলায় যে সব কথার ইঙ্গিত করলে আমি সে সব কথা তোমায় বল্‌তে পারবোনা বাবা! এই অপমানটা আমার প্রাণে যে কত বড় লেগেছে, সে তোমায় কি করে বোঝাব বাবা!" এই কথাগুলি বলিতে বলিতে প্রভার দুই চক্ষু বাহিয়া ফোঁটা ফোঁটা উষ্ণ অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

চন্দ্রকান্তবাবু গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—"এত বড় অপদার্থ সে! আর এত বড় কাপুরুষ! দুর্ভাগ্য অধঃপতিত দেশ আমাদের, এখনও এ দেশের লোকেরা স্ত্রীলোকের মর্য্যাদা রাখতে শেখে নি! মা, তুই কিছু মনে করিস্ নি,—অনেকেই কুৎসিৎ দৃষ্টি দ্বারা স্ত্রীলোককে দেখে, সেজন্যে কি কোন সৎস্বভাবাপন্না চরিত্রবতী নারীর নির্ম্মলপ্রাণে কালিমা লাগ্‌তে পারে? মন ও দেহ যাহার বিশুদ্ধ নির্ম্মল, তার বিরুদ্ধে শত সহস্র মিথ্যা কলঙ্কও স্রোতের ফুলের মত ভেসে দূর হয়ে যায়। যতীন্ আমাদেরি সমাজের লোক—চিরদিন সে দেখে আস্‌ছে ও শিক্ষিতা মেয়েদের সঙ্গে মিশে আস্‌ছে, তবে তার এমন স্বভাব যে কেমন করে হল, সে কথাটা আমি বুঝে উঠ্‌তে পাচ্ছিনে, এমনও ত হতে পারে যে সে তোমাকে অন্য কেউ বলে ভুল করেছে, এ আশ্চর্য্য নয় মা।"

প্রভা কহিল না বাবা! আমার কি অত বড় ভুল হ'তে পারে, দিব্য জ্যোৎস্না রাত্রি, তারপর গিরিডিত খুব বড় যায়গা নয় যে সকলকে চিন্‌তে পারবো না।"

ইদানীং যতীনের সহানুভূতি সূচক কথাবার্ত্তা ও তাহার নিকট হইতে সেয়ার' ক্রয়ের পর হইতে তাহার বিরুদ্ধে' এইরূপ একটা অভিযোগ সহজে বিশ্বাস করিতে চন্দ্রকান্তবাবুর প্রবৃত্তি হইতেছিল না,—প্রভা' যতীনের তাহাদের বাড়ীতে আসা যাওয়াটা পছন্দ করে না বলিয়া চন্দ্রকান্ত বাবু আজকাল অপরাহ্নে একাকী বেড়াইতে বাহির হইয়া একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইয়া যতীনের সহিত মেলামিশা করিতেন এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে আলোচনা করিতেন। প্রত্যহই যতীন ভরসা দিত যে এক বৎসরের মধ্যেই তিনি কোল কোম্পানী হইতে প্রচুর পরিমাণে ডিভিডেণ্ট পাইবেন। তাঁহার এ কথাটা একেবারে অবিশ্বাস করিবার বিরুদ্ধেও কতকগুলি প্রমাণ দাঁড়াইয়াছিল, কারণ বাজারে প্রত্যহই কয়লার দর চড়িয়া যাইতেছিল। যতীনের আশ্বাসবাক্যে প্রলুব্ধ হইয়া চন্দ্রকান্তবাবু সর্ব্বস্বান্ত হইয়াই সেয়ারের বাজি ধরিয়াছিলেন—হয় জীবন—নয় মৃত্যু। এইরূপ পরিচয়ের প্রীতির সহিত এই দুই বৃদ্ধ ও তরুণে গোপনভাবে বেশ একটু বিশ্বাস ও স্নেহের ভাব সঞ্চারিত হইয়া উঠিয়াছিল। যতীন চন্দ্রকান্ত বাবুর অর্থ-লিপ্সার এই দারুণ দুর্ব্বলতাটুকু অবলম্বন করিয়া একে একে তাহার বিরুদ্ধের অভিযোগগুলি খণ্ডন করিয়া তুলিতেছিল। সে স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিল যে যেরূপেই হউক বৃদ্ধের চিত্ত জয় করিতে না পারিলে কোনরূপেই তাহার প্রভাকে পাইবার আশা নাই। চন্দ্রকান্ত বাবু যতীনের বিষয় বুদ্ধির বিচক্ষণতা দেখিতে পাইয়া তাহাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ প্রদান করিয়া প্রত্যহই বলিতেন যে—"যদি তোমার ন্যায় বুদ্ধিমান যুবকের সঙ্গে আমার পূর্ব্বে সাক্ষাৎ হ'ত, তা'হলে কোন মতেই আমাকে

কেউ প্রবঞ্চনা কর্‌তে পার্‌ত না। প্রভার অজ্ঞাতে যে ভিতরে ভিতরে এতটা কল্পনা জল্পনা চলিতেছিল, তাহা সে জানিত না। জানিলে যে সে ক্রুদ্ধা ফণিনীর ন্যায় একটা বিপ্লবের প্রবল তরঙ্গ ছড়াইবার জন্য সচেষ্ট হইত তাহা নিঃসন্দেহ।

প্রভার কথায় চন্দ্রকান্তবাবু কহিলেন—"মা, আমি এ বিষয়ের অনুসন্ধান করবো, সত্য কোন দিন গোপন থাকে না. যতীনের এইরূপ অভদ্র ব্যবহার আমি কোন মতেই ক্ষমার চক্ষে দেখতে পারবো না।" আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন এমন সময়ে পার্ব্বতী একখানা নামের কার্ড হাতে লইয়া আসিয়া কহিল—"বাবু, পথে একটী বাবু গাড়ীতে বসে আছেন, এই কার্ডখানা পাঠিয়েছেন।"

চন্দ্রকান্তবাবু ধীরভাবে কার্ডখানা হাতে লইয়া প্রভাকে ডাকিয়া কহিলেন—"দেখত মা কে এসেছেন? ওরে আলোটা এদিকে নিয়ে আয়।"

আলো আসিলে প্রভা কহিল—"বাবা কে একজন প্রভাত চৌধুরী তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছেন।"

চন্দ্রকান্তবাবু বিস্মিত হইয়া কহিলেন—"কই এ নামে কেউ ত আমার জানার মধ্যে আছে বলে মনে হয় না। আচ্ছা, বাবুকে আস্‌তে বল।"

দুই মিনিটের মধ্যেই প্রভাত আসিয়া চন্দ্রকান্ত বাবুকে প্রণাম করিয়া কহিল—"আপনি বোধ হয় আমার নামের কার্ড পেয়ে অবাক্ হয়েছেন, চিনেই উঠ্‌তে পারেন নি, আমি রমণীবাবুর ছেলে—বাবা আর আপনি নাকি একসঙ্গে পড়াশুনা করেছেন!

চন্দ্রকান্তবাবু এই কথা শুনিবামাত্র প্রভাতকে বুকে টানিয়া লইয়া কহিলেন "ওহো! তুমি রমণীর ছেলে! বটে! তুমি না বিলেত গিয়েছিলে, কবে ফির্‌লে? উঃ সেই এতটুকু তোমায় দেখেছিলুম, আজ

এত বড় হয়েছ! প্রভা! প্রভাতকে নিয়ে ঘরে চল। তারপর প্রভাতকে প্রভার সহিত পরিচয় করিয়া দিয়া কহিলেন—"এই আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রভা! প্রভাত একটু মিষ্টি হাসিয়া নমস্কার করিতেই প্রভা ঘাড় নোয়াইয়া প্রতি নমস্কার করিয়া কহিল "এই দিক্ দিয়ে ভিতরে আসুন। এস বাবা। পার্ব্বতী, বাবুর মালগুলো ভেতরে নাবিয়ে নিয়ে এস।" প্রভাত এই এক মুহূর্ত্তেই বুঝিতে পারিল যে এই তরুণী শুধু যে পিতার অবলম্বন তাহা নহে, তাহা অপেক্ষাও অনেক বেশী—সে এই গৃহের কর্ত্তব্যপরায়ণা নেত্রী ও সর্ব্ব বিষয়ের পরিচালিকা।

৯

প্রভার সহিত পরদিন ভোরের বেলা প্রভাতের পরিচয়টা ভালরূপেই হইয়া গেল। চন্দ্রকান্ত বাবু এই দেবকান্তি তরুণ শিক্ষিত বন্ধু পুত্রটীকে এইরূপ সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে অতিথিরূপে পাইয়া বাস্তবিকই বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রভাতের সহিত আলাপ করিয়া তাহার মনে বহুকাল বিস্মৃত বাল্য জীবনের বহু মধুর কথা স্মৃতি-পথে পড়িয়া বৃদ্ধের প্রাণে অভিনব প্রফুল্লতার সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিল। জীবনের শত অশান্তি যেন কোথায় মিশাইয়া গেল। ভোরের বেলা চায়ের টেবিলে বসিয়া চন্দ্রকান্তবাবু হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"দেখ প্রভাত, রমণী ও আমি পাঠশালা থেকে কলেজ পর্য্যন্ত একসঙ্গে পড়েছি! ছেলে বেলা সে যে কত বড় দুষ্ট ছিল, আজকালকার ছেলেরা, সেকথা কল্পনাও করতে পারবে না!"

প্রভাত হাসিয়া কহিল—"তা'হলে আপনি একালের ছেলেদের খুব গুড্ বয় মনে করেন?"

চন্দ্রকান্তবাবু হাসিয়া কহিলেন—"নিশ্চয়, ওহে, আজকালকার এডু-

কেশন যে তোমাদের দিন দিন কাবু করে ফেল্‌ছে,—আমরাও বই পড়্‌তুম বটে, কিন্তু তোমাদের মত অত বাক্স বোঝাই কেতাবের বোঝা বইতে হ'ত না। তারপর তোমরা হলে ডিস্‌পেপসিয়া গ্রস্ত বাবু, বুঝলে, চোখে চশমা না পর্‌লে কিছু দেখতে পাওনা,—একটা রসগোল্লা খেতেই হাইহুই তোল, আমাদের ও সব বালাই ছিল না। সকলেরই অসুরের মত বল ছিল, দৌড়াতে গাছে চড়তে, নৌকার বাইচ খেল্‌তে বুঝলে তেমন যোয়ান মাঝি বা পালোয়ানরাও পেরে উঠত না।"

প্রভা দেখিতেছিল, আজ তাহার পিতার মুখশ্রীতে একটা উজ্জ্বল আনন্দের জ্যোতিঃ খেলিয়া বেড়াইতেছে, চিন্তাকুল হৃদয়ের বেদনাতে ম্লান বিমর্ষভাব যেন কোথায় চলিয়া গিয়াছে। বহুদিন সে তাঁহার এমন প্রীতিপ্রফুল্ল ভাব দেখে নাই, তাই সেও পিতার এই পরিবর্ত্তনটুকু খুব প্রসন্ন ভাবে গ্রহণ করিতেছিল। সে মৃদুস্বরে কহিল—"বাবা! এখন যদি তোমায় কোন দেবতা আবার সেই আগেকার ছোট দুরন্ত শিশুটি করে দেয়, তা'হলে তোমার খুব আনন্দ হয়—না?"

"উঃ—সে যদি হ'ত তাহলে জীবনে যতগুলি ভুল করে এসেছি, সব শুধ্‌রে নিয়ে আবার নূতন ক'রে জীবনটা চালাতুম! এত অনুতাপ—এত জ্বালা সইতে হ'ত না!"

প্রভাত কহিল—"মানুষ চিরদিনই একথা ব'লে আস্‌ছে—ব্যক্তিগত হিসেবেও যেমন মানুষের এই আক্ষেপ—পৃথিবীর বহুজাতিও ঠিক্ এই কথা নিয়েই হাহাকার ক'রে আস্‌ছে। একটা কথা, এই ভুলটার উপর মানুষের যে কতটা হাত আছে, সে বোঝা দরকার। চিন্তা করে পথ ধরেও কেউ কোন দিন কার্য্যে সাফল্য লাভ কর্‌তে পারেনি, আবার কেউ কেউ কিছু না ভেবে অন্ধের মত চলে গিয়েও বেশ সাফল্য লাভ করেছে, এই যে রহস্য, এ রহস্যের মীমাংসা কোথায় কে জানে? তাই আমার

মনে হয়, সাধারণ একটু চিন্তা করে, তারপর ঈশ্বরের উপর সব নির্ভর করে পড়ে থাকাই শ্রেয়ঃ।"

চন্দ্রকান্তবাবু কহিলেন—"এতটা নির্ভর যদি মানুষের থাকৃত, তাহলে বোধ হয় এত হিংসা, দ্বেষ পৃথিবীর বুকে বাসা বেঁধে থাকৃত না।"

প্রভা মৃদুস্বরে কহিল—"না আপনারা যে রকম দার্শনিক তর্ক সুরু করে দিলেন, মূর্খ মেয়ে মানুষ আমি, আমি যে তাল সাম্‌লে রাখ্‌তে পাচ্ছিনা।"

পাশের ঘরে তখন বীণার কণ্ঠ শোনা যাইতেছিল——

"জাগ মা! জাগ মা! ভারত-জননী,
চির সুন্দর সুধা-নির্ঝর কোটি সন্তান পালিনি!"

প্রভাত একটু কাণ পাতিয়া শুনিয়া কহিল—"কে ওঘরে গান গাইছেন?"

চন্দ্রকান্তবাবু একটু বিস্মিত হইয়া কহিলেন—"আহা। তোমার সঙ্গে এখনও আমার বীণার পরিচয় হয়নি? আশ্চর্য্য ত! মা প্রভা একবার বীণাকে এ ঘরে ডেকে নিয়ে আয় না?"

প্রভাত হাসিয়া কহিল—"তিনি এখন যে ভাবে দেশ-জননীর আবাহন-গীতি গাইছেন, এ সময়ে কোন মতেই তাঁর ধ্যান ভাঙ্গা উচিত নয়। বিকেলবেলা পরিচয় করে নেবে এখন।" প্রভাত কোন দিনই নিরীহ লাজুক গোচের ছেলে ছিল না, সে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মানুষের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিয়া লইতে পারিত। কাল এ বাড়ীতে আসিয়া রাত্রিকালেই অতি অল্প পরিচয়ের মধ্যে প্রভার সহিত ও চন্দ্রকান্তবাবুর সহিত পূর্ণভাবে পরিচয় হইয়া গিয়াছিল।

চন্দ্রকান্তবাবু কহিলেন—'হ্যাঁ, হে! তোমার বাবা হঠাৎ এত সাহেব ঘেঁসা হয়ে উঠ্‌লেন কি করে? ছেলেবেলায় ত সে মস্ত বড় প্যাট্রিয়ট

ছিল—সর্ব্বদা "কতকাল পরে বল ভারতরে, দুঃখ-সাগর সাঁতারে পার হবে।" এসব গান গাইত—কতবার যে গোরা-ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে লড়াই করেছে তার সীমা-সংখ্যা নেই, শুধু বড় লোকের ছেলে বলে কতবার পুলিসের রক্ত-চক্ষু এড়িয়ে বেঁচে গেছে। শেষটায় সেই রমণী কিনা, রাজা খেতাব পর্য্যন্ত নিলে।"

প্রভাত হাসিয়া কহিল—"শুধু তাই নয়, তাদের খোরাক জুগিয়ে জুগিয়ে জমিদারী নীলামে তুলবার ব্যবস্থা পর্য্যন্ত অনেকদূর এগিয়ে এনেছেন।"

চন্দ্রকান্তবাবু মৃদুস্বরে কহিলেন—"বটে!—ইদানীং রমণী তেমন খোঁজ খবর নেয় না, পূর্ব্বে কিন্তু আমাকে জিজ্ঞেস না ক'রে এক পাও এগুত না।"

প্রভা কহিল—"আচ্ছা, আপনারা তাঁর দোষ দিচ্ছেন বটে, কিন্তু যাদের ঘরে বাস করি, তাদের মন না জুগিয়ে কি করে চলা যায়। বিশেষতঃ রাজা জমিদারদেরত উপায়ই নাই—কালেক্টর সাহেব চোখ রাঙালেইত দুনিয়া অন্ধকার দেখ্‌তে হয়। আচ্ছা বিলেতে কি রকম দেখ্‌লেন!"

প্রভাত ধীর গম্ভীর-স্বরে কহিল—"সব দেশেই ভাল মন্দ আছে, সকলেই ভাল,এমন বড় কোন একটা দেশে দেখা যায় না, কিন্তু অধিকাংশ লোকই ভাল, কর্ম্মদক্ষ একথা ইংলণ্ডের লোকদের পক্ষে খুবই প্রযুজ্য। এদেশের সাহেবদের দেখে, সেদেশের ইংরেজদের বিচার করা ভুল। খুব ভাল ইংরেজও এদেশে এসে সেলাম পেতে পেতে বিগ্‌ড়ে যায়। সামান্য স্বার্থপরতা নিয়েই যাদের জীবন, নিজ সংকীর্ণ ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য যারা একজন জাত ভাইয়ের বিরুদ্ধে লাগাতে ইতস্ততঃ করে না, তাদের মনুষ্যত্ব যে কত বড় হেয় তাকি বলে দিতে হয়! একটা সতেজ

সাহসিকতার সঙ্গে সঙ্গে যদি একটা কর্ত্তব্যপরায়ণতা থাক্‌তো তাহলে আমরা মানুষ হতেম, আমার মনে হয়, সেই জাগ্রত বুদ্ধি একদিন না একদিন নিশ্চিয়ই আমাদের জেগে উঠ্‌বে। কর্ত্তব্যের প্রয়োজনীয়তায় যতটুকু প্রয়োজন, তার সেই সীমা লঙ্ঘন করে, আপনাকে হেয় অপদার্থ করে তোলা আমার মত নয়। মানুষকে আপনার পায়ে নির্ভর করে স্বাধীনভাবে দাড়াতে দেওয়ার সর্ব্বপ্রকার সুযোগ করে দেবার পথ যে ভাবেই হয় খুঁজতে হবে।"

প্রভা হাসিয়া কহিল—"আপনি যে একেবারে একৃষ্টি মিষ্ট।"

"যা বল্‌তে হয় বলুন, প্রত্যেক মানুষের নিজ দেশকে ভালবাসাও কি একটা শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য নয়?"

চন্দ্রকান্তবাবু প্রভাতের উদ্দীপনাপূর্ণ বাক্য ধীর ভাবে পরম উৎসাহের সহিত শুনিতেছিলেন, এইবার মৃদুভাবে কহিলেন—"তোমার বাবা কি তোমার মনের এ ভাব জানেন?"

"আজ্ঞে হ্যা, বলেছি বৈ কি। এই দেখুন না, তাঁর ইচ্ছা ছিল, আমি একটা সরকারি চাকরী নিই,—আর বেশ কোন বড় লোকের মেয়ে বিয়ে করে—কতকগুলো টাকা কাড় পাওয়ার ব্যবস্থা করি,—আমার এমনি দুর্ভাগ্য যে বাবার দু'টো অনুরোধের একটাও রাখ্‌তে পারলুম না। চাকরী—সে করবো না—বিয়ে সেত এখন পর্য্যন্ত ভাব্‌নার মধ্যেই নেই। গিরিডি এসেছি কেন, সে কথা আপনি জানেন না,—সুরযমল ঝুন্‌ঝুন্‌-ওয়ালা—একজন খুব বড় ধনী মাড়োয়ারি, তাঁর সঙ্গে মিলে মিশে গিরিডি ও তার আশেপাশে দুই একটা কয়লার খাত ও অভ্রের খাত বন্দোবস্ত করতে চাই। যে পর্য্যন্ত না আমাদের ব্যবসা দাড়াবে, ততদিন আমি খরচ পত্র নির্ব্বাহের জন্য মাসিক দু' হাজার করে টাকা পাব,—ব্যবসা দাঁড়িয়ে গেলে ব্যবসায়ের একটা অংশ ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালা দেবেন। এরূপ

লেখাপড়া হয়েছে। এক্ষুণি আমরা একবার খাত দেখ্‌তে বের হব। এসব বিষয়ে আপনার সঙ্গেও আমার অনেক আলোচনার দরকার হবে, কারণ আপনি এখানে অনেকদিন আছেন। এদেশের অনেক সংবাদই রাখেন।"

চন্দ্রকান্তবাবুর প্রাণে যেন কি এক অমানুষিক শক্তি জাগিয়া উঠিল, তিনি পরম উৎসাহের সহিত কহিলেন—"তোমার মুখে একথা শুনে আমি বিস্মিত ও পুলকিত হয়েছি। বিদেশ থেকে নানা কলকারখানা, শিল্প বাণিজ্য বা কৃষিকার্য্য শিক্ষা করে এসে যে সব যুবকেরা সরকারি চাকরির জন্য উমেদার হয় আমি তাদের ঘৃণা করি। এইত চাই—ব্যবসা বাণিজ্য দ্বারাই আমাদের দেশের দুঃখ দারিদ্র্য দূর করবার ব্যবস্থা করার দিকে শিক্ষিত মানুষ মাত্রেরই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আমি বাবা, তোমার এই উৎসাহ দেখে ও দৃঢ়তা দেখে আনন্দিত হয়েছি। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার বাসনা পূর্ণ হউক, তুমি ব্যবসায়ে কৃতকার্য্য হয়ে, একটা নূতন পথের পথিক হও।"

চন্দ্রকান্ত বাবুর উৎসাহ-বাণীতে প্রীত হইয়া প্রভাত কহিল—"বাবা, প্রথমটায় খুব আপত্তি তুলেছিলেন, তাঁকে বুঝিয়ে শেষটায় রাজি করেছি। এদিকের একটু ব্যবস্থা করেই আমি একবার দেশে যাব; বাবাত শুধু টাকাই ব্যয় করেছেন,আর শুধু আমলা কর্ম্মচারিদের উপর নির্ভর করেছেন, প্রজা সাধারণের সঙ্গে তাঁর প্রাণের যোগ রাখ্‌তে পারেননি,—তাঁর সেই অখ্যাতিটা আমি দূর কর্‌তে চাই—আমাদের ঋণের মাত্রাটা যে খুব বেশী হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাতে কোন ভুল নেই, কিন্তু আমাদের সম্পত্তির যদি ভাল বিলি ব্যবস্থা করা যায়, তা'হলে ঋণ শোধ হতে বেশী সময় লাগবে বলে বোধ হয় না, জমিদারির কাগজ পত্রগুলো দেশে নিয়ে একবার নাড়া চাড়া কর্‌তে চাই—এসব নানা বিষয়েই আমি আপনার উপদেশ গ্রহণ করতে

এসেছি,—বাবা আপনাকে ভোলেন নি, গিড়িডি আস্‌বো শুনেই আপনার এখানে আস্‌বার জন্যে বলে দিয়েছিলেন। আপনি যে শুধু আমার পিতৃ বন্ধু তা নয়, আপনি আমাদের পরিবারের একজন প্রকৃত হিতৈষী।"

প্রভা নীরবে সব কথা শুনিতেছিল; সে হাসিয়া কহিল—"মিঃ রায়, আপনি বাবাকে খুব আচ্ছা হিসেবী লোক ঠাউরেছেন, যা হ'ক, ব্যবসা ব্যবসা করে যিনি নিজের সর্ব্বস্ব পরের হাতে সঁপে দিয়ে ভীষণ দারিদ্র্যকে বরণ করেছেন, তাঁর কাছে এসব কাজে উৎসাহ যে পাবেন তা নিশ্চিত; কিন্তু প্রাক্‌টিকেল দিক্‌টা যে বাবার খুব বেশী আছে তা মনে হয় না, তা হ'লে এমন করে সর্ব্বস্ব খুয়ে ফেল্‌তেন না।

প্রভাত কহিল—"আপনি ও কথা বল্‌বেন না, মিস্ বসু। কল্পনার ভিতর দিয়েই মানুষ কাজ করে, এঞ্জিনিয়ার একটা বিরাট সৌধের আকৃতি-টাকে প্রথমত মানস-চক্ষেই গড়ে তোলে, তারপর ধীরে ধীরে মুটে মজুর রাজমিস্ত্রী খেটেও তার পূর্ণশ্রী ফুটিয়ে তোলে। কল্পনা চিরদিনই বড়, যে যত বড় শ্রেষ্ঠ লেখক, শ্রেষ্ঠ কবি, শ্রেষ্ঠ শিল্পী, শ্রেষ্ঠ কারিগর তারা সকলেই কল্পনার প্রিয় শিষ্য। তারপর ব্যর্থতার কথা বল্‌ছেন? জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনার সিদ্ধির ফল—বিজয়ের গৌরব মাল্য—যাঁরা কণ্ঠে পরেছেন, তাঁরা সকলেই ব্যর্থতার ভিতর দিয়ে এসেছেন, সেজন্য দুঃখ করবারও কিছুই নাই। আপনার বাবা, হয়ত নিজের জীবনে অর্থ ও সম্মান বা সফলতা ভোগ করে যেতে না পারেন, কিন্তু আপনারা যে তা পাবেন না, সেকথা কে বল্‌তে পারে?"

এই যুবকের সরল ও নির্ভীক উক্তির মধ্যে যে কত বড় সাহস ও আত্ম-নির্ভরের ভাব ছিল সে কথা চিন্তা করিয়া প্রভা ও চন্দ্রকান্ত বাবু উভয়েই বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। প্রভা আজ বুঝিতেছিল যে তাহার পিতা দেশের কতকগুলি ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য টাকা দিয়া কোন অন্যায়

করেন নাই ;—যাহারা একটা না একটা ব্যবসায়কে দাঁড় করাইবার জন্য চেষ্টা কচ্চে, তাহাদের মধ্যে সকলেইত আর অসাধু নয়! এই ভাবে তাহাদের তর্ক আরও কতকক্ষণ চলিত বলা যায় না, কিন্তু এরূপ সময়ে পার্ব্বতী আসিয়া কহিল—"একজন" মাড়োয়ারী ভদ্রলোক মোটর গাড়ীতে এসে, বাইরের ঘরে বসেছেন, সাহেবের সঙ্গে দেখা কর্‌তে চাইছেন।" প্রভাত তৎক্ষণাৎ প্রভা ও চন্দ্রকান্ত বাবুকে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল। বাহিরে মোটরের ভোঁ বাজিয়া উঠিল—"বোধ হয় এই তারা বেরিয়ে গেলেন।" তারপর একটু নীরব থাকিয়া পরে কহিল—"আচ্ছা, বাবা, তোমার মিঃ রায়কে কেমন মনে হচ্চে।" চন্দ্রকান্ত বাবু কোনরূপ চিন্তা না করিয়া কহিলেন—"চমৎকার! আমাদের দেশের ছেলেরা অনেকেই যদি প্রভাতের মত হত, তাহলে আর কি দুঃখ ছিল?"

"বাবা, একদিনে সব হয় না,কোনদিন ভারতবর্ষ এমন করে আপনার দিকে তাকাবার অবসর পায়নি। সংকীর্ণতা দূরত্ব ও জাতি ভেদের নিগড়ে গড়া যে পাষাণ প্রাচীর মিলনের অন্তরায় রূপে দাঁড়িয়েছিল, এখন সে প্রাচীর দিন দিন ভেঙ্গে আস্‌ছে। আজ ভারতের উপর দিয়ে মিলনের যে মধুর অমৃত সাগরের ঢেউ ছুটে আস্‌ছে, সে অল্পদিনের মধ্যেই এ-জাতিকে মহৎ করে তুলবে। সে মধুর মিলন-গীতিই আজ চারিদিক্ থেকে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠ্‌ছে।"

চন্দ্রকান্ত বাবু কহিলেন—'প্রভাত, এখানে এসে আমার মনে আবার নবীন উদ্দীপনা জাগিয়ে দিয়েছে। তবে শোন্ মা—আমি তোদের না জানিয়ে, তোদের ন্যায্য সম্পত্তি তোদের মায়ের দান, সেই শেষ সম্বল দশ হাজার টাকা দিয়েও কোল সেয়ার কিনেছি। এতদিন বলিনি, তবে আমার কতদূর অন্যায় সে আমি জানি, মা, তুই আমায় ক্ষমা করবি ত?"

প্রভা পিতার পায়ের ধূলি মাথায় তুলিয়া লইয়া কহিল—"বাবা, বোধ হয় দু'দিন আগে হলে তোমাকে মন্দ বল্‌তুম, কিন্তু এখন আর কোন কথা কইবনা। তুমি দেশের ও আমাদের কল্যাণের জন্ত যে কাজ করেছ, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তা সফল হউক। আমি তোমায় যে করেই হউক সাহার্য্য করবো। ঢের বেলা হয়েছে বাবা, তুমি এখন স্নান করবে এস।" চন্দ্রকান্ত বাবু কোন কথা কহিলেন না, তাহার মুখে শান্তির হাসি জাগিয়া উঠিল, আজ আর তাহার প্রাণে কোন অবসাদের চিহ্ন রহিল না।

১০

গাড়ী বারান্দায় মোটর প্রস্তুত করিয়া সোফার গাড়ীর পাশে দাঁড়াইয়া আছে। মিঃ চৌধুরী খাত দেখিবার জন্ত বাহির হইবেন, এরূপ সময় ডাক হরকরা একরাশ চিঠি দিয়া গেল। আফিসের চিঠি পত্র গুলি একবার উল্টাইয়া দেখিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিলেন, শুধু একখানা চিঠি হাতে লইয়া চৌধুরী সাহেব মিসেস চৌধুরীর কক্ষে যাইয়া কহিলেন—"এই দেখ, গুরুপ্রসাদ চিঠি লিখেছে, তুমি পড়ে রেখে দিও। আমি ঘুরে আসি, তারপর যা হয় পরামর্শ করে একটা ব্যবস্থা করা যাবে।" চৌধুরী সাহেব সিগারটা ভাল করিয়া ধরাইয়া প্রফুল্ল মুখে চলিয়া গেলেন। মিসেস্ চৌধুরী একখানা সোফার উপর শরীর এলাইয়া দিয়া একটা সেলাই লইয়া বসিয়াছিলেন। স্বামী চলিয়া গেলে পত্র খানা পড়িলেন—পত্র লেখক গুরুপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী, একজন নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্ম, এই পরিবারের হিতৈষী বন্ধু। তিনি লিখিয়াছেন—

৬

সুহৃদ্বরেষু,—

আমি আজ রমণীবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম, তাঁহার ছেলে মিঃ প্রভাত রায়, বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, সে সংবাদ তুমি জান, রমনীবাবু আমাদের সমাজের লোক না হইলেও চিরদিনই সমাজের হিতকামী, বাহিরের দিক্ হইতে তাঁহার সমাজের সহিত ঘনিষ্ট যোগ আছে। তাঁহার সহিত আলাপে যেরূপ বুঝিলাম, তাহাতে কল্যাণীয়া অনীতা মায়ের সহিত শ্রীমান্ প্রভাতের বিবাহ হওয়া অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। প্রভাত বিলাত হইতে ইঞ্জিনিয়ারীং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছে—বহু স্থান হইতে ভাল ভাল কার্য্যের প্রস্তাবও আসিয়াছিল, কিন্তু সে সকল উপেক্ষা করিয়া বড় বাজারের বিখ্যাত মাড়োয়ারী সূর্য্যমল ঝুনঝুনিওয়ালার সহিত কয়লা ও অভ্রের ব্যবসা করিতে দৃঢ়সংকল্প হইয়া আজ দুই তিন দিন হইল গিরিডিতে গিয়াছে। গিরিডির চন্দ্রকান্ত বাবু রমণীবাবুর বাল্যবন্ধু, প্রভাত তাঁহাদের বাড়ী থাকিবে। কল্যাণীয়া অনীতাও এখন তোমার ওখানেই আছে; তুমি সুযোগ উপেক্ষা করিও না। প্রভাতকে যাহাতে হাত করিতে পার, সে ব্যবস্থা কর। দীনদয়ালের কৃপায় আমি সুস্থ আছি। ভগবৎসমীপে তোমাদের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল সতত কামনা করিতেছি। ইতি—

তোমার প্রাণপ্রিয়তম সুহৃদ্
শ্রীগুরুপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী।

মিসেস্ চৌধুরী চিঠিখানা দু'তিনবার পড়িলেন। তারপর কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া নিজ শয়ন কক্ষে যাইয়া উহা টেবিলের দেরাজে রাখিয়া দিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেলেন। ঠিক্ সেই সময়ে অনীতা নীচ হইতে উপরে মাতার নিকট আসিতেছিল। চৌধুরাণী মনে মনে

কহিলেন—আমার মেয়ের এই রূপেই প্রভাত বন্দী হবে। সমাজের কয়জন মেয়ে এমন সুন্দরী?

এমন সময়ে অনীতা মাতার হাত ধরিয়া কহিল—"কি ভাব্‌ছো মা?"

চৌধুরাণী হাসিয়া কহিলেন—'কিছু নয় মা!' এই বলিয়া কন্যার চিবুক স্পর্শ করিয়া মুখখানা একটু উঁচু করিয়া ধরিয়া কহিলেন—"তোমার কি কোন অসুখ করেছে মা? এত রোগাটে দেখাচ্ছে যে?"

অনীতা ধীরে ধীরে মায়ের গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—"হাঁ, মা তুমি বুঝি দিন রাত্তির আমাদের অসুখের কথাই ভাব?"

মিসেস্ চৌধুরী একটু হাসিয়া কহিলেন—'একদিন তুইও এমন কথা বল্‌বি মা!'

অনীতা মাতার কাছ হইতে একটু দূরে সরিয়া খোলা জানালার পাশে গিয়া দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল—দূরে 'খণ্ডোলি' পাহাড়ের ধূসর গায়ে প্রখর রৌদ্র-দীপ্তি ঝলসিয়া উঠিয়াছে, উশ্রী নদীর বুকে জল ঝিকিমিকি করিতেছে,—মহুয়াকুঞ্জের প্রস্ফুটিত উগ্র মদিরাময় পুষ্প সৌরভে ব্যাকুল ভ্রমর গুঞ্জরিয়া ফিরিতেছে, আর দূরে দূরে কয়লার খনিগুলির চিম্‌নি হইতে প্রচুর ধূমরাশি কুণ্ডলি পাকাইয়া ঊর্দ্ধদিকে উঠিতেছে।

অনীতা ও বীণা এক সঙ্গে পড়ে, দুইজনেই আজ অল্প কয়েক দিন হইল গিরিডি ফিরিয়া আসিয়াছে। বাহিরের দিক্ হইতে দুই জনের মধ্যে মিলনের যথেষ্ট অন্তরায় থাকিলেও বীণা ও অনীতার মধ্যে গভীর সৌহার্দ্য ছিল। তাহারা গিরিডি থাকিয়াও আজ কাল করিয়া উশ্রী নদীর জলপ্রপাত দেখিয়া আসিতে পারে নাই। কাল বিকেল বেলা "ক্রিশ্চিয়ান" পাহাড়ের উপর উঠিয়া দুইজনে সেখানে যাইয়া প্রপাতটী দেখিয়া আসিবার একটা সঙ্কল্প করিয়াছিল,—নদী আরও ফুটাইয়া লইবার জন্য

উভয়ের মনে মনে একটু ইচ্ছাও ছিল, সে তারও পৃথক্ ভাবে উভয়ে লইয়া আসিয়াছিল। অনীতার সে কথা মনে পড়িতেই সে হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মাকে কহিল—"হাঁ, মা! চলনা কাল একবার উশ্রী প্রপাতটা দেখে আসি?"

অনীতার কথায় মিসেস চৌধুরী প্রীতা হইয়া কহিলেন, "সে বেশ ত। আমিও ভাব্ছি, কোথাও একবার একটু বেরিয়ে এলে হয়। উনি আসুন, সব ঠিক্ করে দিতে বল্‌বো। সেখানে শুধু যাওয়া নয় 'বন-ভাতি'ও খাওয়া যাবে। যতীনকে বল্‌বো, আজ থেকেই যেন সবটার যোগাড় যন্ত্র করে, নতুবা শেষটায় মহা বেগ পেতে হবে।"

অনীতা হাসিয়া কহিল—"দাদাকে ভার দেবে? তবেই হয়েছে, সব ভুলে বসে থাক্‌বেন এখন, কোন কথা কইতে গেলেও চটে লাল হবেন। এমন গোঁয়ার মানুষকে কি কোন কাজের ভার দিতে হয়?"

"বটে? আমার নিন্দে করা হচ্চে? আমি বাড়ী না থাক্‌লেই বুঝি ডলি' তুই আমার এমন করে সমালোচনা করিস্?" যতীন সিঁড়ির মুখে দাঁড়াইয়া অনীতার শেষ কথা কয়টি শুনিয়া হাসিতে হাসিতে সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়া একথা কয়টি কহিল।

মিসেস্ চৌধুরী হাসিয়া কহিলেন,—"কথাত মিথ্যে নয়, তুই কোন কাজের ভার নিলেই আমার মনে হয় যে—সে কাজটার কোন না কোন বঞ্ঝাট এসে জুট্‌বেই জুট্‌বে। এবার এ কাজের ভারটা নিয়ে প্রমাণ করে দাও যে তুমি কাজের যোগ্য।"

যতীন্ ধীর স্বরে কহিল—"কাজটা কি শুনি?"

অনীতা কহিল—"আমরা উশ্রী প্রপাতে দেখতে যাব ও সেখানে 'বনভাতি' খাব, তোমায় সে সব বন্দোবস্ত কর্‌তে হবে। বল, পার্‌বে?"

যতীন্ হাসিয়া কহিল—"কে, কে যাবে শুনি ?"

"সে কথায় তোমার কোন্ লাভ দাদা ?"

"আহা ! বুঝতে পাচ্ছিস্ না 'ডলি'; আমায় লোক জনের বরাদ্দ বুঝে গাড়ীর বন্দোবস্ত; খাবার জিনিষপত্রের বন্দোবস্ত সব ঠিক্ করতে হবে ত ? না, অমনি মুখে মুখেই সব হবে।"

"উঃ তাহলে দেখছি দাদার ঘটে একটু বুদ্ধি আছে ; আচ্ছা দাঁড়াও, আবার পালিও না যেন, আমি একটা লিষ্ট করে, আমার প্ল্যান ঠিক করে আনি।"

এই কথা কহিয়া অনীতা ধীরে ধীরে তাহার নিজের কক্ষে চলিয়া গেল। এইবার সুযোগ বুঝিয়া মিসেস্ চৌধুরী জিজ্ঞাসা করিলেন— "হ্যাঁরে যতীন, তুই রামপুরের জমিদার রমণীবাবুকে জানিস ?"

"কোন্ রমণীবাবু মা ?"

"যিনি 'রাজা' খেতাব পেয়েছেন। বড় জমিদার।"

"উঃ যার ছেলে প্রভাত, আজ পাঁচ ছয় মাস হল বিলেত থেকে বড় ইঞ্জিনিয়ার হয়ে ফিরে এসেছে ? খবরের কাগজে যার ছবি বেরিয়ে ছিল, সেই প্রভাতের বাবা রমণীবাবুর কথা বল্‌ছো ?"

"তুই কি তাঁকে জানিস্ নাকি ?"

যতীন্ কহিল—"না, শুধু নামে জানি, সে আমাদের দু'বৎসরের জুনিয়ার, প্রেসিডেন্সীর নাম করা ছেলে, নাম জানব না, কি অদ্ভুত কথা।"

"তাকে কখনও দেখেছিস্ ?"

যতীন্ ঘাড় বাঁকাইয়া দৃঢ় কণ্ঠে কহিল—"বিলেত যাওয়ার আগে, সেত রোজই কলেজে দেখেছি, ফিরে আস্‌বার পর আর দেখিনি। চমৎকার দেখতে, বেশ লম্বা, ফর্সাপানা চেহারা। আচ্ছা, তার কথা এত জিজ্ঞেস কচ্ছো কেন মা ?"

এইবার মিসেস্ চৌধুরী গুরুপ্রসাদ বাবুর পত্রের মর্ম্ম প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"তোর কেমন মনে হয় ?"

যতীন্ হাসিয়া কহিল—"বল কি ? তাহলে যে একটা কাজের মত কাজ হয়।"

"তবে শোন্ যতীন্! প্রভাত এখানে এসেছে, তাকে একবার আমাদের বাড়ী আনতে পারিস্ ? আমি ছেলেটিকে একবার দেখতুম্।"

যতীন্ হাসিয়া কহিল—"যখন গিরিডিতে এসেছে, তখন সে আর তেমন কঠিন কাজ কি মা ? কালই কেন উশ্রী জলপ্রপাত দেখবার জন্য নেমন্তন্ন করে, আমাদের পার্টির একজন করে ফেলি না ? কি বল ?"

যতীন্ ভেতরে ভেতরে তাহাদের বংশের অগৌরবের অনেকটা খবরই জানিত। এইরূপ একটা বর্দ্ধিষ্ঠ কায়স্থ পরিবারের সহিত তাহাদের কোনও পারিবারিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে যে তাহা বিশেষ গৌরবের কারণ হইবে, এবং সমাজে প্রতিপত্তি বৃদ্ধির পক্ষেও যথেষ্ট সুযোগ হইবে, ইহা মনে করিয়া সে বস্তুতঃই মাতার কথায় আনন্দিত হইয়া কহিল—"আমাদের ডলির সঙ্গে প্রভাতের দিব্য মানাবে। যে করেই হয়, বাবাকে বলে এ সম্বন্ধটা স্থির করে ফেল। কাল প্রভাতকে আমাদের দলে জুটিয়ে নেওয়ার ভার আমি নিলুম।"

মিসেস্ চৌধুরী কহিলেন—"তা, বেশ, তুমি আজই একবার চন্দ্রকান্ত বাবুর সঙ্গে দেখা করে, প্রভাতের সঙ্গে পরিচয় করে এস। আমি ওঁকে বলে সব ঠিক করবো এখন।"

কন্যা উপযুক্ত পাত্রে অর্পিত হয়, এ কামনা কোন জননী না করেন ? বিশেষতঃ যেখানে এমন সুযোগ এসে উপস্থিত হয়, তাতে

কোন মতেই উপেক্ষা করা চলে না। মিসেস্ চৌধুরী ফিরিয়া আসিতেই। চৌধুরাণী সব কথা প্রকাশ করিয়া কহিলেন। চৌধুরী সাহেব ইজি-চেয়ারে গা ঢালিয়া দিয়া পরম তৃপ্তির সহিত প্রৌঢ়া গৃহিনীর গাল টিপিয়া দিয়া কহিলেন—"সত্য সত্যই দেখছি তুমি দ্বিতীয় দ্রৌপদী? রণে-বনে-দুর্গমে পতির বুদ্ধি দাতা মন্ত্রী।' চৌধুরা পত্নী স্বামীর প্রতি কোপ-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন—"হ্যাঁ, আমি কি পাপ করেছি যে দ্রৌপদী হতে যাব?"

১১

প্রভাতের কাজ সারিয়া ফিরিতে বেলা প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছিল,—সে ফিরিয়া আসিতেই প্রভা হাসিমুখে অভ্যর্থনা করিয়া কহিল—"সাহেব মানুষ, অথচ খাবার সময় ঠিক্ রাখ্‌তে পারেন না? ক'টা বেজেছে, একবার সেই খোঁজ রাখেন কি?"

প্রভাত কহিল,—"আমায় মাপ্ করবেন মিস্ বসু, আপনাদেরও বুঝি খাওয়া হয়নি। কাজের ভিড়ে দেরী হয়ে গেল, যে দু'দিন থাক্‌বো বরং ডাক-বাংলোতে গিয়ে থাকি, রোজ একবার করে আপনাদের সঙ্গে দেখা করে গেলেই চল্‌বে, কি বলেন?"

প্রভার উজ্জ্বল মুখশ্রী হঠাৎ বিষণ্ণভাব ধারণ করিল, সে মৃদুস্বরে কহিল—"তবে—কেন এই গরীবের কুটীরে অতিথি হয়েছিলেন? কোন প্রয়োজন ছিলনা, আস্‌বার।"

কেন যেন তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছিল। প্রভাত হ্যাটটা ঘরের ব্র্যাকেটের উপর রাখিয়া অপ্রতিভ ভাবে কহিল—"আমায় ক্ষমা কর্‌বেন, মিস্ বসু! আমি আপনাকে আঘাত দেওয়ার জন্য বলিনি,—এই দেখুন না, ফেরবার কোন ঠিক্ সময় নেই, আপনি একটা বেলা

পর্য্যন্ত না খেয়ে রয়েছেন, আপনার বাবাও হয়ত খাননি? তাই বল্‌ছিলুম।"

প্রভা লজ্জিত হইয়া কহিল—"সে কোন কথা নয়,—আমরা মেয়ে মানুষ, সংসারের দশটা ঝড় ঝঞ্ঝাটের ভেতর দিয়েই জীবন চালাতে হ'বে —তারপর ব্রাহ্ম বলে যে আমরা একটা 'আর্টিফিশিয়েল' জীবন অতিবাহিত করি, সে কল্পনাও ভুল, আমাদেরও ত করে কর্ম্মে খেতে হয়। মেয়েরা লেখাপড়া শিখ্‌লেই যে একেবারে হাঁড়ি চড়াতেও জানে না, এমন কথা ভাবাও খুব ভুল। আপনি আসুন—আমি সব ঠিক করিগে।"

প্রভাত নীরবে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া জামা কাপড় ছাড়িয়া খাইবার জন্য প্রস্তুত হইল।

অল্পসময়ের মধ্যেই প্রভাতের সহিত এইরূপে ধীরে ধীরে দু' চারিটী কথায় এই পরিবারের সহিত বেশ ঘনিষ্টতা হইয়া গেল।

মানুষের ভালবাসা বা আত্মীয়তা অনেক সময় দীর্ঘ পরিচয়েও যাহা হয় না, সময়ে সময়ে তাহা অল্প দুই চারিটী কথায়ই হইয়া যায়। কে জানে, ইহার সহিত পূর্ব্বজন্ম ও পরজন্মের কোনও অজ্ঞাত শক্তি কার্য্য করে কিনা! রৌদ্র পড়িয়া গিয়াছে, সূর্য্য পশ্চিমদিকের দিগন্ত নীল ধূসর গিরিশ্রেণীর আড়ালে লুকাইতে যাইতেছেন। মহিষেরদল লইয়া সাঁওতাল পুরুষ, রমণী ও বালকের দল বাড়ীর দিকে ফিরিতেছে,—মহিষের গলায় ঘণ্টারব এবং দূরবর্ত্তী পল্লীর উৎসব-নিরত পুরুষ ও রমণীগণের সঙ্গীতের অপরিস্ফুট ধ্বনির সহিত মাদলের মদিরতাভরা আবেগধ্বনি মাঝে মাঝে বাতাসের বুকে ভর করিয়া ভাসিয়া আসিতেছে। পূবের খোলা বারান্দায় চারিখানা চেয়ারে বসিয়া প্রভাত, প্রভা, বীণা ও চন্দ্রকান্ত বাবু সারাদিনের গ্রীষ্মের জ্বালা নিবারণের আশায় আসন্ন সন্ধ্যার শীতল-বায়ু সেবনের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। বীণার কোলে বাড়ীর দুষ্ট মিনি

পুসি পরম আরামে ঘড়ঘড় শব্দ করিয়া ঘুমাইতেছে। চন্দ্রকান্তবাবু নীরবতা ভঙ্গ করিয়া কহিলেন—"এ সব গরমের যায়গায়—সন্ধ্যার বাতাসটা স্বাস্থ্যের পরম অনুকূল। ভোর ও সন্ধ্যাবেলার বাতাস যেন বিধাতার দান।

প্রভাত কহিল—"বেশীদিন শীতের দেশে থেকে—হঠাৎ গ্রীষ্মপ্রধান স্থানে এলে, বাস্তবিকই প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে, আর আমাদের পশ্চিমের গরম ত অতি ভয়ানক।"

প্রভা হাসিয়া কহিল—"সুখের পরেই যেমন দুঃখ, তেমনি এখানে গ্রীষ্মের পরেই যে শীত আসে, তাহাও নেহাত কম নয়। দুই-ই উগ্রতায় সমান।"

বীণা পরম আদরের সহিত বিড়ালের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল—"মিঃ রায়, আর কদিন এখানে থাকবেন ?"

"আর ৩।৪ দিনের বেশী নয়, আমাদের কাজ বোধ হয় কালই শেষ হয়ে যাবে। তারপর দু' একটা দিন এদিকে যা কিছু দেখবার দেখবো, আমি কোন যায়গায় কাজেই হউক কি বেড়ানার জন্যই হউক, শুধু সহরের রাস্তা ঘাট দেখে বেড়ান শেষ করতে ভালবাসিনা। বলুন না, আপনাদের এখানে কি কি দেখবার আছে ?"

এইবার বীণা প্রফুল্লমনে উৎসাহের সহিত উচ্চৈঃস্বরে কহিল—"উঃ ঢের ঢের দেখবার জিনিষ আছে, এই ধরুন না খন্ডোলি পাহাড়, উস্ত্রী জলপ্রপাত, পরেশনাথ পাহাড়, কয়লার খনি, ঢের দেখবার যায়গা আছে।"

"বেশ ত কাল একটা 'প্রগ্রাম' করে ফেলুন, বলে রাখছি, আমাকে কিন্তু দু' তিন দিনের ভেতর সব দেখিয়ে বিদায় দিতে হবে। গিরিডি থেকে বরাবর বাড়ী যাব, তারপর এসে কাজকর্ম্ম দেখতে হবে। বুঝলেন মিস রায়।"

চন্দ্রকান্তবাবু কহিলেন—"বীণাকে গাইড কর, সে এখানকার সব খবর রাখে।"

বীণা বিড়ালটাকে কোল হইতে মাটিতে নামাইয়া দিয়া চীৎকার করিয়া কহিল—"ভারি ত আমি গাইড, এতদিন গিরিডিতে রয়েছি, আজ যাই কাল যাই করে উশ্রী প্রপাতটা পর্য্যন্ত দেখা হ'ল না। না মিঃ রায়! আমি কিছু জানিনা, দিদিকে পাকড়াও করুন, বেশী কথা বলেন না, চুপ করে থাকেন বলে বুঝি মনে কচ্ছেন, কিছু জানেন না, তা নয়, প্রভাদিদি গিরিডির সব খবর রাখেন।"

প্রভাত কোন উত্তর দিবার আগেই প্রভা কোপ কটাক্ষে বীণাকে ভৎর্সনা করিয়া কহিল—"কি যে বাজে বকিস্—তার ঠিক নেই। প্রভাত বাবুর কি গাইডের অভাব হবে নাকি ?"

বীণা হাততালি দিয়া দূরে সরিয়া গিয়া কহিল—"দেখলে বাবা, দিদি, এম, এ, পাশ করেও কিছুমাত্র worldly হল না, বিলেত ফেরত মানুষ, তাঁকে মিঃ না বলে, দিদি কিনা, মিঃ রায়কে প্রভাতবাবু বল্‌ছেন ? হো—হো—হো।"

চন্দ্রকান্তবাবু সপ্রতিভ ভাবে কহিলেন—"চুপ কর বীণা, ছিঃ।"

প্রভাতের কাছে এই সরল সঙ্কোচবিহীনা স্পষ্টভাষিনী কিশোরীর নির্ম্মল রসাভাষ বড়ই ভাল লাগিতেছিল—সে হাসিয়া কহিল—"বীণা, তোমার দিদিই ঠিক্ বলেছেন, আমরা বাবুই ত বলি,—বাঙ্গালীর ছেলে দু' তিন বৎসরের জন্ম বিলেত গেলেই কি খোলস বদ্‌লে সাহেব হয় নাকি ? যারা বাবু বল্‌লে চটে যান, তারা নেহাৎ অপদার্থ। নিজ জাতি ও সমাজকে হেয় কর্‌তে যারা কোন কুণ্ঠ বোধ করেন না, তারা বস্তুতঃই কাপুরুষ। তুমিও আমায় মিঃ না বলে, বাবু বলে ডেকো, বাবু নামই আমাদের বেশ মিষ্টি ডাক। শ্রীযুত ত আরও বেশী সুন্দর, সেটা লিখতে

বেশ, কিন্তু বল্‌বার সময় শ্রীযুক্ত অমুক চন্দ্র বলে সম্বোধন করতে গেলে, কেমন বিশ্রী শোনায়।"

চন্দ্রকান্তবাবু কহিলেন—"তোমার এই আত্ম মর্য্যাদার ভাব আমার কাছে খুবই নূতন বলে মনে হচ্চে। যারা বিলেত যান, তাঁরা যদি কাজকর্ম্ম ছাড়া, সব সময় সাহেবী পোষাক পরে থাকেন, সে এক অদ্ভুত দেখায়। ধুতি চাদর পরা বাঙ্গালী কি দেখতে মন্দ দেখায়? এমন অনেক বিলেত ফেরত বাঙ্গালী আছেন, তারা ধুতি চাদর পরতেও লজ্জা বোধ করেন!"

প্রভা বীণার কৌতুক বাক্যে সত্য সত্যই একটু লজ্জা বোধ করিতেছিল, এইবার প্রসঙ্গটা যখন অন্যদিকে চলিয়া তাহারি পক্ষ সমর্থন যোগ্য হইয়া উঠিল, তখন সে নীরব থাকা শ্রেয়ঃ মনে করিল না,—মৃদুস্বরে কহিল,—"বাবা, তবু তারা বিলেতের মাটিতে পা ঠেকিয়েছেন, কিন্তু তাদের স্ত্রী কন্যারা কি করে 'মেম সাহেব' বা 'মিসি' বাবা হয়ে উঠেন, এ আমি ভেবেই উঠতে পারিনা। এমন ভাবে জাতীয়তা বিসর্জ্জনে কি লাভ?"

প্রভাত কহিল—"এই দুর্ব্বলতা নিয়েই আমরা পেছনে পড়ে যাচ্ছি। কাজেকর্ম্মে সাহেবদের ন্যায় সময়ের মূল্য ও সহিষ্ণুতা থাকা ভাল, কিন্তু খাওয়া দাওয়া চলা ফেরা সব বিষয়েই তাদের অন্ধ অনুকরণ আমার মোটেই ভাল লাগেনা। বিলেত থেকে যারা শিক্ষালাভ করে এসেছেন, তারা সেই শিক্ষা দানের সঙ্গে সঙ্গে সাহেবিয়ানা ভাবটা দূর করে আদর্শ শিক্ষক ও উপদেষ্টা হতে পারেন, তবেই না সমাজের লাভ।"

চন্দ্রকান্তবাবু কহিলেন,—'দেখ, কেবলি তাদের দোষ দিলে চলতে পারে না। আজকাল সমাজে যে পরিবর্ত্তনের স্রোত এসেছে, পঁচিশ বৎসর আগেও তা ছিল না। তখন যারা বিলেত থেকে ফিরে আসতেন,

হিন্দু-সমাজ তাদের জন্য 'প্রবেশ নিষেধ' বানী প্রচার করে দিতেন, কোথায় তারা যায়? মানুষ ত আর একা থাকতে পারে না! একটা সমাজকে আশ্রয় করেইত তাদের থাকতে হবে; ফলে কেউ ব্রাহ্ম সমাজের বুকে আশ্রয় পেলেন, কেউ বা খ্রীষ্টান হলেন, সে সময়ে যদি হিন্দু সমাজ এই উচ্চশিক্ষিত দেশের গৌরব রত্নগুলিকে বুকে টেনে নিতেন, তাহলে কোনদিকেই কোন গোল হত না। এখন ত হিন্দু সমাজ উদার হয়েছেন,—বরং হিন্দুদের মধ্যে যত বড় উদারতা দেখতে পাওয়া যায় অনেক সময় ব্রাহ্মসমাজেও তা দেখতে পাওয়া যায় না।"

চন্দ্রকান্তবাবুর কথা শেষ হইতে না হইতেই পার্ব্বতী একখানা কার্ড লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। চন্দ্রকান্তবাবু তাড়াতাড়ি বাহিরের দিকে চলিয়া গেলেন। কে আসিল, কেনই বা চন্দ্রকান্তবাবু এত দ্রুত বাহিরে চলিয়া গেলেন, সে কথা ইহারা জানিতে পারিল না।

কৌতুহল নিবৃত্ত হইতে বেশীক্ষণ লাগিল না। তাহারা বিস্ময়ের সহিত দেখিল যে মিঃ চৌধুরী তাহার পুত্র যতীনকে সঙ্গে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। সকলে মিঃ চৌধুরীকে সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করিয়া লইল। মিঃ চৌধুরী প্রভাত ও বীণার দিকে চাহিয়া কহিলেন,—'তোমরা বস, মা।' তারপর পিতা ও পুত্রে পাশাপাশি দুখানি চেয়ারে আসন গ্রহণ করিল। চন্দ্রকান্তবাবু প্রভাতের সহিত তাঁহার পরিচয় করিয়া দিলেন, ইতিমধ্যে কখন যে প্রভা ও বীণা চলিয়া গিয়াছিল সেদিকে কেহই লক্ষ্য রাখেন নাই। মিঃ চৌধুরী আসন গ্রহণ করিয়া পকেট হইতে দেশলাই ও চুরুট বাহির করিয়া চুরুট ধরাইয়া কহিলেন—"অনেক দিন কাজ কর্ম্মের ভিড়ে এদিকে আসতে পারিনি, আজ মনে হল যে আপনাদের একবার দেখে যাই। সব ভাল ত চন্দ্রকান্তবাবু?"

অনেকদিন কেন, কোন দিনই মিঃ চৌধুরীর চন্দ্রকান্তবাবুর বাড়ী

দরিদ্র ভদ্রলোকের খোঁজ লইবার প্রয়োজন হয় নাই, তবে যতীনের সহিত যে তাঁহার গোপনে গোপনে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হইতেছিল, সে শুধু 'কোল সেয়ারের' কথা লইয়া। চন্দ্রকান্তবাবু মিঃ চৌধুরীর কথায় ধীর স্বরে কহিলেন,—"তা আপনার দয়া, আপনি সর্ব্বদা কাজের ভিড়ে থাকেন, কি করে আস্‌বার সুযোগ পাবেন? তা, আজ কি মনে করে গরীবের কুটীরে এলেন?"

যতীনের কাছে কিছুই যেন ভাল লাগিতে ছিল না, সে আসিয়া প্রভাকে দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছিল,—কিন্তু প্রভা যে একটা অতৃপ্তির ভাব প্রকাশ করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল, সেই দৃষ্টিটুকু যতীনের চক্ষু এড়ায় নাই। প্রভা যে তাহার জীবনের একমাত্র ধ্রুবতারা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার দর্শন, তাহার কথা, প্রাণের মধ্যে যে এক অভিনব আনন্দের উন্মেষ করিয়া দেয়, তাহা যতীন প্রত্যহই গভীররূপে উপলব্ধি করিতেছিল। যে আকর্ষণের মদির আবাহনে সে এখানে আসিয়াছিল, সেই মানস প্রতিমার অন্তর্ধান যে কত বড় গভীর বেদনাদায়ক তাহা যতীন ব্যতীত অন্যের পক্ষে উপলব্ধি করা ত সহজ নহে। যতীন নীরব নিশ্চল প্রস্তর মূর্ত্তির মত বাহিরের দিকে চাহিয়াছিল। চন্দ্রকান্তবাবুর সহিত তাহার পিতার কি কথোপকথন হইতেছে, সেদিকে কোন লক্ষ্যই ছিল না। চন্দ্রকান্ত বাবুর কথার উত্তরে হাসি মুখে মিঃ চৌধুরী কহিলেন—"আজ আমি আপনার কাছে একটু প্রয়োজনে এসেছি, যদি অভয় দেন, তাহলে কথাটার উল্লেখ করতে সাহস করি।"

চন্দ্রকান্তবাবু উচ্চহাস্য করিয়া কহিলেন,—"আমার কাছে কি প্রয়োজন আপনার? হ্যাঁ—ভয় অভয় আবার কি? বলুন না, কি করতে হবে আমায়?"

প্রভাত কোন কথা না বলিয়া মিঃ চৌধুরীর আচার ব্যবহার ও কথা বার্ত্তার ভাব ও ভাষা লক্ষ্য করিতেছিল। মিঃ চৌধুরীর সহিত তাহার পরিচয় হইলে একটা সেকহ্যাণ্ড ও দুই একটী কথা ছাড়া আর তেমন কোনও কথাবার্ত্তা হয় নাই।

মিঃ চৌধুরী কহিলেন—"আমার স্ত্রীর একটা অনুরোধ এই যে কাল তাঁরা সকলে মিলে উশ্রী প্রপাতের ওখানটায় একটা পিক্‌নিক্ করবেন। আপনাদের সকলের সেখানে নিমন্ত্রণ। আমরা সব ভোরে বেরুব, খাওয়া দাওয়া সেরে, শেষটায় বেলা পড়তে বাড়ী ফেরা যাবে। বোধ হয় আমার এ অনুরোধটা কোনমতেই উপেক্ষা করবেন না, দেখুন চন্দ্রকান্তবাবু, মিঃ রায়ের সঙ্গে আমার এইমাত্র পরিচয়—তাঁকে আমার কোন কথা বল্‌তে বিশেষ সঙ্কোচ বোধ হচ্চে, তবু তাঁকে আমি বিনীত ভাবে অনুরোধ কচ্চি, যদি তিনিও আমাদের সঙ্গী হন, আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হব। আমাদের আর্জ্জি মঞ্জুর হল কিনা, সে কথাটা আমি জান্‌তে পারি কি মিঃ রায়।"

প্রভাত হাসিয়া কহিল—"আমি চন্দ্রকান্তবাবুর দ্বারস্থ, তিনি যেদিকে চালাবেন, সেদিকেই চল্‌ব।" চন্দ্রকান্তবাবু কিয়ৎকাল নীরবে চিন্তা করিয়া সাদরে মিঃ চৌধুরীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। মিঃ চৌধুরী ধন্যবাদ দিয়া এবং তাহাদের সহিত করমর্দ্দন করিয়া সিগারের ধোঁয়া উড়াইতে উড়াইতে রাস্তার দিকে চলিলেন। যতীনের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল।

১২

সুধীরের কাছে প্রথম প্রথম নৈনিক জীবনের কঠোর বন্ধনগুলি বড়ই অদ্ভুত বলিয়া ঠেকিতেছিল। কোন মুক্তি কোন স্বাধীনতা নাই, ঘণ্টার

রব শুনিয়া শয্যা হইতে উঠিয়া অমনি 'কাওয়াজ' করিতে মাঠে বাহির হইয়া ছুটাছুটি দৌড়াদড়ি, নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে স্নান আহার সম্পন্ন করিয়া আবার সেই রণশিক্ষা, জীবনে সে কোনদিন এমনভাবে সময়কে বাঁধিয়া চলাফেরা করে নাই। যতদিন সে নিজ বাড়িতে ছিল, ততদিন কেবলি বি এ, এম, এ, পাশের কথা, অর্থ উপার্জ্জনের ইতিহাসই সে শুনিয়াছে; কিন্তু এখানকার সঙ্গীদের মধ্যে দুই চারিজন ছাড়া, অনেকের বিদ্যাই তার চেয়ে বেশী নয়! আর এখানকার সঙ্গীদের মধ্যে যে সরলভাব বিদ্যমান—প্রাণ খুলিয়া যেমন পরস্পরের সহিত মেলামেশা চলে, নিজ মাতৃভূমি বাঙ্গালাদেশে সে যেন কাহার কাছে তেমন প্রাণের টান দেখিতে পায় নাই।

এ দলের সৈনিকগণের অধিকাংশের বাড়ীই পূর্ব্ববঙ্গে। পূর্ব্ববঙ্গবাসী যুবকেরা যে সাধারণতঃ নির্ভীক ও সাহসী সে কথা এই যুবকেরা অধিক সংখ্যায় সৈন্যদলে যোগ দিয়াই প্রমাণ করিয়াছে।

সুধীর সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে নিজ ক্যাম্পে বসিয়া—"কেদার রায়ের" জীবন-চরিত পড়িতেছিল। তাহার কাছে বাঙ্গালী বীর কেদার রায়ের অমানুষিক রণনৈপুণ্য ও নৌযুদ্ধের কথা এক অপূর্ব্ব স্বপ্নের ন্যায় মনে হইতেছিল। সেই চারিশত বৎসর আগে একজন বাঙ্গালী বীর নিজ মাতৃ-ভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কেমন করিয়া মোগল সৈন্যের গতি প্রতিহত করিয়াছিল, সেকি ভুলিবার কথা।

সুধীরের কাছে বারভুঁইয়ার বীরশ্রেষ্ঠ কেদার রায়ের বীরত্ব-কাহিনী যেন জীবন্ত চিত্রের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছিল। সে মানস চক্ষে দেখিতেছিল, পদ্মার তীরে রাজা বাড়ীর মঠটা যেন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে,—আর মেঘনারই কালোজলে প্রবল তরঙ্গ গর্জনে তীরভূমি প্রতিধ্বনিত হইতেছে। একদিকে বাঙ্গালী বীরেরা রণতরীর বুকে

থাকিয়া রুধিরাক্ত মোগল নোবহরের সহিত যুদ্ধ করিতেছে। আকাশে কালো বৈশাখীর কালো মেঘমালার বুকে তড়িৎ লেখা রণরঙ্গিনীর লেলিহান জিহ্বার মত লকলক করিয়া দীপ্তি প্রকাশ করিতেছে। মোগল হারিল—আর বাঙ্গালা বীরেরা জয়লাভ করিয়া বিজয়বাণী ঘোষণা করিতে করিতে রাজবাটীর দিকে ফিরিয়া চলিল। সুধীর মনে মনে গৌরব বোধ করিতেছিল যে, সে বাঙ্গালী—ভীরু কাপুরুষের জাত নহে। এমন সময়ে তাহার ক্যাম্পে আর একটী যুবক আসিয়া উপস্থিত হইল—সে সুধীরকে বহি লইয়া মনোযোগ সহকারে পড়িতে দেখিয়া হাসিয়া কহিল—"Hallo my dear old boy! what are you doing?"

সুধীর তড়াক করিয়া লাফাইয়া বিছানার উপর বসিয়া কহিল—"Good night, Mr. Ghose! বলি কি মনে করে? বোস্ না ভাই।"

ঘোষ মিলিটারি কায়দায় সেলাম দিয়া ক্যাম্পের অভ্যন্তরস্থ একখানা ছোট টুলের উপর বসিয়া কহিল—"শুনিছিস্ রায়? পরশুদিন আমাদের 'মেনপোর্ট' যেতে হবে।"

সুধীর আনন্দের সহিত কহিল—"কি করে জান্লি?"

"চক্রবর্ত্তী বলাবলি কর্‌ছিল।"

"বেশ, তা'হলে বেশ হয়, আর কয়টা ভাল লাগছে না, সৈনিক সেজে এসেছি যখন, তখন একটা লড়াই না কর্‌তে পারলে ভাল লাগে না। এ যেন একটা অলস জীবন!"

ঘোষ আসিয়া কহিল—"হ্যাঁ, অলস বৈকি? এক রত্তি অবসর নেই, দিন রেতে খেটে হয়রান হলুম, মাইরি বল্‌ছি, আগে এত ক্লেশ হবে জান্‌লে কখ্‌খনো আস্‌তুম না।"

"একথা বলিস্‌নে ভাই, আমাদের জীবন যাক্ ক্ষতি নেই, হাড়

কখনো থাক্ বা না থাক্ কি আসে যায়, কিন্তু বাঙ্গালীর গৌরব আমাদের রাখতেই হবে। মরণ সেত দেশে থেকেও হতে পারত, বাঙ্গালাদেশে ত আর যমরাজার ফৌজের অভাব নেই!"

"তোমার কি ভাই, বলে দিচ্ছি দু' তিন মাসের মধ্যেই একটা সুবেদার হয়ে যাবি। তোর রেজিমেণ্টে যে সুখ্যাতি বেরিয়েছে, সকলেই বল্‌ছে যে সুধীর খাঁটি Soldier! হ্যাঁ, ভাই, কদিন যাবত মনটা বড় খারাপ, দেশের কোন খবর পাচ্ছিনে, কে যেন বল্‌ছে যে আর দেশ, আত্মীয়-স্বজন ভাববার কোন দরকার নেই। এখন শুধু রণরঙ্গিনা শশ্মানচারিণী কালীমূর্ত্তির কথা ভাব, আর মনে কর— ঐ ভেরী বাজে—চলে আয় বীর সাজে। জীবন বৃথা—যদি না মরি দেশের কাজে।

সুধীর দৃঢ়স্বরে কহিল,—"ঠিক্ কথা। ভগবান আছেন, তিনিই আত্মীয় স্বজনদের কথা ভাব্‌বেন,আমাদের ওসব ভেবে কাজ নেই, ততক্ষণ aim ঠিক্ করলে লাভ হবে।"

"দেখ্ সুধীর, তোর কথা শুনে মনে হয়, দেশে যেন তোর কেউ বেঁচে নেই, কার জন্যে তোর ভাবনা নেই, অথচ মাঝে মাঝে দেখি সমুদ্রের ধারে একলাটি বসে কি যেন ভাবিস্। বলতে পারিস্—কেন, কেন তোর এমন ভাব?"

সুধীর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল—"ঘোষ, এই রেজিমেণ্টে ঢুকে অবধি, তুই আমায় ভালবাসিস্, তোকে কোন কথা গোপন করব না। আমার বাবা আছেন, মা নেই, আর দু'টী বোন্ আছে। বাবা সামান্য কয়েকটা টাকা পেন্সান পান, বড় দিদি এম, এ, পাশ করেছেন, ছোট বোন্ বীণা এবার আই, এ, পরীক্ষা দিয়েছে। আমি ভাই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষাটা পর্য্যন্ত পাশ করতে পারলুম না, শিক্ষিত

পরিবারের মূর্খ ছেলের পরিণাম জানিস্ ত,—পাছে সকলের মুখে কালি পড়ে, তাই আমি নূতন পথের পথিক হয়েছি। দেখি যদি দেশের জন্য সামান্যও একটা কিছু করতে পারি কিনা।"

এইরূপ নানা গল্প করিয়া ঘোষ তাহার ক্যাম্পে চলিয়া গেল। সুধীর চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল—"এই বেশ—এই বেশ—একটা নূতন উন্মাদনা, উৎসাহ ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া জীবন চালান, এতদিন ভগবানের কাছে যা চেয়েছিলুম, তাই পেয়েছি। কে জানত যে আমাদের মত বাঙ্গালীর ছেলেকে দুর্দ্দণ্ড প্রতাপ আরব ও তুর্কী সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধে যেতে হবে। ঈশ্বর শুধু এই বলে দাও, যেন দেশের নাম রক্ষা করতে পারি।" এমন সময় বিউগেল বাজিয়া উঠিল—মুহূর্ত্তে রেজিমেণ্টে আদেশ প্রচার হইল যে তাহাদিগকে করাচি ছাড়িয়া সমুদ্র-পথে অন্য কোথাও যাইতে হইবে। পলকমধ্যে সব তাঁবু উঠিল। আবার বিউগেল বাজিল। সকলে প্রস্তুত হইয়া অগ্রসর হইল।

১৩

গিরিডি বেড়াইতে গিয়া যিনি উশ্রী জলপ্রপাত না দেখিয়া ফিরিয়া আসেন তাহা, তাহার পক্ষে দুর্ভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। প্রভা কোন মতেই এ দলের সহিত যাইতে প্রথম স্বীকার করে নাই, অথচ যদি সে না যায় তাহা হইলে অশোভন হইয়া উঠে, বিশেষ প্রভাত ত কোন মতেই তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে রাজি হইল না। গৃহকর্ম্মের অজুহাতেও সে বাড়ী থাকিতে পারিল না। তিনখানা মোটরে করিয়া সকলে প্রপাতের পথে অগ্রসর হইল,—সবটা পথ ঘোড়ার গাড়ী বা অন্য কোন গাড়ী চলে না, দেড় মাইলের কিছু উপর হাঁটিয়া যাইতে হয়। সকলে সেই সংকীর্ণ পার্ব্বত্য-পথের ভিতর দিয়া চলিল। দুইদিকে ছোট বড় শাল তরু শ্রেণী,

স্তরে স্তরে বিন্যস্ত তরঙ্গায়িত লাল মাটির বুকে দাঁড়াইয়া আছে। রৌদ্র তখন অজস্রভাবে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আকাশ গভীর ঘন নীল—মেঘের লেশ মাত্রও নাই। পথের পরিশর অতি অল্প—বীণা ও অনীতা হাত ধরাধরি করিয়া চঞ্চলা হরিণীর ন্যায় আগে আগে ছুটিয়া চলিয়াছে, চৌধুরী সাহেব ও চন্দ্রকান্তবাবু তাহাদের পশ্চাতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন। মিসেস্ চৌধুরী ও যতীন্ লোকজন সাজ সরঞ্জাম সহ প্রত্যূষেই চলিয়া আসিয়াছিলেন। প্রভাত ও প্রভা সকলের পশ্চাতে অতি ধীর গমনে সকলের অনুসরণ করিতেছিল।

পথের পাশে কোথাও গর্ত্ত, কোথাও গরুর গাড়ির চাকার দাগ, কোথাও দুই একটী বন্য পশুর পদ-চিহ্ন। একজন কৃষক বালক বাঁশীর সুরে মধুর আলাপ করিতেছিল—অদূরে তাহার গো-মহিষের পাল মনের আনন্দে সবুজ সুন্দর তৃণাদির সদ্ব্যবহার করিতেছিল। প্রভাত একটী সুন্দর সাদা বন টগর হাতে লইয়া কহিল—'কি সুন্দর! দেখেছেন, মিষ্টার রায়! লোক চক্ষুর অগোচরে আপনার মনে ফুটে রয়েছে। আমি ফুল বড় ভাল বাসি। আমাদের দেশের বনে জঙ্গলে অনেক মূল্যবান্ অর্কিড থাকে, কিন্তু কেউ কোন সন্ধান জানেন না বলে সংগ্রহ করতে পারে না। আপনি ফুল কেমন পছন্দ করেন?' কথার স্রোতের মধ্যে তাহার হাতের সেই পুষ্প স্তবকটি কোন্ সময় যে সে প্রভার হাতে তুলিয়া দিয়াছিল, সেদিকে সে কোন খেয়ালই করে নাই। প্রভা সযত্নে প্রভাতের সেই পুষ্প স্তবকটি নাকের কাছে ধরিয়া কহিল—"এ ফুলে গন্ধ নাই, কিন্তু সৌন্দর্য্য আছে, রূপ ও সৌরভ একসঙ্গে খুব বেশী বন-ফুলে মিলে না।"

প্রভাত অন্য প্রসঙ্গ তুলিয়া কহিল—"দেখুন, এইভাবে পুরুষ ও নারী এক সঙ্গে মিলে মিশে বেড়ান যে কত বড় আনন্দের সে আমাদের দেশের

লোকেরা জানে না। বিলেতে excursion জিনিষটা প্রত্যেক শনিবারেই হয়, কলেজের ছেলে মেয়েরা এক সঙ্গে সমুদ্রের ধারেই কিংবা কোন গ্রামেই হউক বেড়াতে যায়, সঙ্গে অধ্যাপকও থাকেন, আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে অনেক শিক্ষাই অতি সহজে হয়। আমার যদি পয়সা থাক্‌তো তাহ'লে পাড়াগাঁয়ে ওধরণের স্কুল খুলতাম, যেখানে পড়া একটা বিভীষিকা হবে না, বরং তাদের মুখে আনন্দ-শ্রী ফুটে উঠ্‌বে।"

প্রভা কহিল—"দেখুন, আমারও মনে এ কথাটাই বিশেষ করে জেগেছে, কলেজে যে লেখা পড়া শিখেছি, সে শিক্ষা শুধু, সেলি, বাইরণ, সেক্সপীয়র মুখস্থ করেই হয়েছে, কিন্তু যে শিক্ষা নারীকে প্রকৃত গৃহস্থালী শিক্ষা দেয়, সন্তানকে মানুষ করবার মত শিক্ষা দেয়, সে শিক্ষা কি পেয়েছি বলুন? শুধু ছবির মত সাজ্‌বার বিদ্যে শিখেছি—আর শিখেছি আলস্য ও ঔদাস্য—কোন প্রয়োজনীয় কাজ কর্‌তে গিয়েই প্রতিমুহূর্ত্তে মনে হয় যে নিজকে হেয় করে ফেললুম, এই যে আত্ম-সম্মান বা ভদ্রতার ছদ্মবেশ আমাদের শিক্ষিতা নারী সমাজকে দিন দিন পঙ্গু করে তুল্‌ছে, আমাদের পুরুষেরা সে কথা কই একবারও ত ভাবেন না।"

"পুরুষেরা ভাব্‌বেন কি? তাঁদের ভাব্‌বার মত শক্তি কোথায়? আপনি কি মনে করেন কোন্ জাতি দু'চার জন বড় লোককে নিয়ে দাড়াতে পারে? সমাজ বা জাতি তখনই জাগ্রত ও উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠে যখন সাধারণের মধ্য থেকে সাড়া পাওয়া যায়। আমরা যারা বিলেত থেকে ফিরে এসে বেশ একটু প্রতিষ্ঠা করেছি, তারা ত সাহেবের চেয়েও বেশী সাহেব! দেশের বাড়ী ঘর পরিত্যক্ত শ্মশান, দেশের আত্মীয়-স্বজন ভাই বন্ধু হৃদয়ের মধ্য থেকে বহুদূরে চলে গেছে। একটা মুখোস পরে দিন চালাচ্ছি। দেশকে যদি জাগাতে হয়, দেশের ধন-সমৃদ্ধি যদি বৃদ্ধি কর্‌তে হয়, তাহলে সাধারণের মধ্যে দেশাত্মবোধটা জাগিয়ে তুল্‌তে হবে, বিলাতী

বিলাসিতায় নাগ-পাশের বাঁধন ছাড়্‌তে হবে। না—থাক্‌—কত কি বাজে বক্‌ছি।"

প্রভা হাসিয়া কহিল—না না মিঃ রায়। প্রভাত বাঁধা দিয়া কহিল—আবার মিষ্টার বল্‌তে সুরু কর্‌লেন যে?

প্রভা লজ্জিত হইয়া কহিল—"আচ্ছা প্রভাত বাবু, আপনাদের মত শিক্ষিত লোক যদি দেশের কাজে ব্রতী হন, তাহলেই দেশের কাজ হবে। আপনারা আমাদের টেনে নিবেন, তবে ত আমরা কাজের মানুষ হব।"

বীণা দূর হ'তে চীৎকার করিয়া উঠিল, "দিদি! ঐ শোন কেমন শব্দ হচ্চে, আর বেশী দূর নয়। ছুটে এসে—ওঃ মিঃ রায় দৌড়ে আসুন। তা আর আস্‌বেন আপনারা—দু'জনে যে গল্প জুড়ে দিয়েছেন।"

অনীতা মাঝে মাঝে প্রভাতকে দেখিতেছিল,—প্রভাতের চিত্ত জয় করিবার জন্য যে তাহার পিতা মাতা এই কৌশলের আয়োজনটুকু করিয়াছেন তাহার ইতিহাস সে মাতার নিকট হইতে শুনিয়াছিল,—মিসেস্ চৌধুরী চতুরা রূপশী কন্যাকে সব কথা খুলিয়াই বলিয়াছিলেন। তাই অনীতা আজ প্রজাপতির মত নানা বিচিত্র পোষাকে সাজিয়া আসিয়াছিল। প্রভাত তাহাদের দলে মিশিয়া আসিবে এ আশা সে করে নাই, কিংবা প্রথমবার নারী সুলভ স্বাভাবিক লজ্জার দিক্ দিয়াও স্বাভাবিক বলিয়া অনীতা আজ একটু দূরে দূরেই যাইতেছিল, কিন্তু বুদ্ধিমতী চতুরা তরুণীর দৃষ্টি মাঝে মাঝে পশ্চাতে যে ঘুরিতেছিল, তাহা বীণা পাশে থাকিয়াও বুঝিতে পারে নাই কিংবা ভ্রমণের এই অপূর্ব্ব উত্তেজনায় সে দিকে লক্ষ্য করে নাই।

প্রভাতের প্রাণে কি যেন একটা নবীন উৎসাহের পুলক-গীতি ঝঙ্কারিয়া উঠিতেছিল। প্রভার সৌন্দর্য্য—প্রভার জ্ঞানের গাম্ভীর্য্য—প্রভার পিতৃভক্তি ও গৃহস্থালীর নৈপুণ্য এই দুইদিনের মধ্যেই তাহার

চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। পাকা জহুরীরা যেমন রত্ন চিনিয়া লইতে বহু সময়ের প্রয়োজন হয় না, এক নিমিষেই তাহা আসল কি ঝুটা ধরিয়া ফেলে, তেমনি প্রভাতের দেশ-ভ্রমণ জনিত প্রচুর অভিজ্ঞতা ও বহুদেশের নারী সমাজের সহিত সংমিশ্রণের ফলে একটা স্বাভাবিক সূক্ষ্মদৃষ্টি দিয়াছিল, যাহা বাহিরের রূপসাগরেরই লহরমালা ভেদ করিয়া ভিতরে কোথায় রত্ন নিহিত আছে তাহারও সন্ধান লইতে সম্পূর্ণ সক্ষম ছিল। প্রভাতের কাছে কাজেই প্রভার সঙ্গ ও কথোপকথন বিশেষ আনন্দের কারণ হইয়াছিল—তাহার কতকগুলি বাঁধা বুলি ভাল লাগিত না। বাহ্যিক সভ্যতার অন্তরালে যে প্রাণের প্রীতি লুকান থাকে তাহাকে গোপন রাখিয়া চলা-ফিরা করিলেও তাহা আত্ম-প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারে না।

ক্রমে তাহারা সকলে আসিয়া উশ্রী প্রপাতের পাশে পঁহুছিলেন। প্রপাতের একধারে একটা খোলা উচু যায়গায় তাঁবু ফেলিয়া যতদূর সম্ভব আরামের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। যতীন্ ও মিসেস্ চৌধুরী সকলকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। চন্দ্রকান্ত বাবু মিসেস্ চৌধুরীকে নমস্কার করিয়া কহিলেন—"আপনাকে কি বলে ধন্যবাদ দোব জানিনা, আমাদের মত বুড়ো মানুষের পক্ষে যে আবার এই প্রপাত দেখা হবে তা ভাবিনি, প্রভাত এস বাবা, ইনি মিসেস্ চৌধুরী—আমাদের host, আর এর নাম হচ্চে মিঃ প্রভাত চন্দ্র বসু রায়। আমার বাল্য-বন্ধু রামপুরের জমিদার রাজা ধরণীধরের ছেলে। এই দুই চারিটী কথায় উভয়ের মধ্যে পরিচয় করাইয়া দিয়া চন্দ্রকান্ত বাবু একখানা আরাম কেদারায় বসিয়া পড়িলেন। প্রভাত মিসেস্ চৌধুরীকে ধন্যবাদ জানাইয়া কহিল—"আজ আপনার অনুগ্রহেই আমাদের উশ্রী প্রপাত দেখা হল।" মিসেস্ চৌধুরী অনীতাকে ডাকিয়া কহিলেন—'অনীতা—এদিকে এস ত মা।' মায়ের

আহ্বানে অনীতা তাহার নিকট উপস্থিত হইলে মিসেস্ চৌধুরী—প্রভাতের সহিত তাহার পরিচয় দিয়া কহিলেন—"মিঃ বসু এইটী আমার মেয়ে অনীতা, এবার ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়েছে।"

অনীতাকে অভিবাদন করিয়া প্রভাত কহিল—"আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব খুশী হলেম।" অনীতা কোন কথা বলিতে পারিল না, তাহার মুখ লাল হইয়া গিয়াছিল, নাক ও গাল প্রচুর পরিমাণে ঘামিয়া উঠিয়াছিল,—যাহার মুখ হইতে খইয়ের মত অনবরত কথার লহর ছুটিয়া যায়, আজ তাহার মুখ দিয়া একটী কথাও বাহির হইল না—দূরে যাহাকে লক্ষ্য করিতে তাহার চোখের দৃষ্টি নত হয় নাই, পা কাঁপে নাই, তাহারি সান্নিকটে দাঁড়াইয়া কোন কথা বলিতে যেন তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছিল। অনীতা প্রভাতকে একটী নমস্কার করিয়া দূরে সরিয়া যাইয়া বীণার পাশে দাঁড়াইল। প্রভা তাহার এই অভিনয় ভঙ্গী পরম কৌতূহলের সহিত উপভোগ করিতেছিলেন, এই সময় যতীন্ কোন্ দিকে লক্ষ্য না করিয়া প্রভার নিকট এক পেয়ালা চা লইয়া যাইয়া কহিল—"উঃ পথে বড় কষ্ট পেয়েছেন মিস্ রায়! দয়া করে এ পেয়ালাটী খেয়ে ফেলুন, অনেকটা আয়েস পাবেন।" প্রভা কোন কথা না বলিয়া পেয়ালাটী গ্রহণ করিল, তাহার বুক দূ-র্ দূ-র্ করিতেছিল।

এই ভাবে চা পানের পর সকলে প্রপাত দর্শনোদ্দেশ্যে বিভিন্ন দিকে বাহির হইলেন। প্রপাতটী বড় সুন্দর বড় মনোরম। যত দূর দৃষ্টি চলে শুধু গাছের পর গাছ তাহার শ্যামলা মাধুরী লইয়া নীলিমার তলে বিরাজমান। দূরে দূরে ধুসর গিরিশ্রেনী রৌদ্র কিরণে গাঢ়নীল দেখাইতেছে। কোথায় কোন্ নির্জ্জন গিরিগহ্বর হইতে চঞ্চলা উর্ম্মী বাহির হইয়া বন পথে তরু বীথির সবুজ ছায়ায় আপনাকে আবৃত রাখিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে। সে জানেনা সে কাহাকে চায়, অথচ কে যেন তাহাকে ডাকিতেছে, তাহার

সেই ব্যাকুল বাঁশরী আহ্বান এই দূরে পর্ব্বতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বনের তরু-কুঞ্জের মূক প্রাণের তারেও আঘাত করিয়াছে, তাহারা কোন মতেই চঞ্চলা উগ্রী বালিকাকে আড়াল করিয়াও রাখিতে পারিতেছে না। দূর হইতে প্রবলবেগে সে ছুটিয়া আসিয়া বন্ধুর শিলাগাত্রে আঘাত করিয়া শত ধারায় বিভক্ত হইয়া ছুটিয়া আসিয়াছে। যে বন্ধনকে তুচ্ছ করিতে জানে, তাহাকে কে বাঁধিয়া রাখিতে পারে? যাহার বাহির হইতে আহ্বান আসিয়াছে তাহাকে আর কি ঘরে ফিরান চলে। শত হস্ত উচ্চ শিলাগাত্র হইতে ঝর ঝর্ ঝম্ ঝম্ ঝর্ ঝর্ ঝর্ ঝর্ রবে নীচে শত রাম-ধনুর রঙ্গের লহর জাগাইয়া দিয়া সে বাহিরের দিকে কলরবে ছুটিয়া চলিয়াছে—সকলে মনের আনন্দের সহিত এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন।

প্রভা ও প্রভাত প্রপাত হইতে একটু দূরে দুইটী শাল গাছের ঘন ছায়ায় একটী সিলার উপর বসিয়া প্রপাত দেখিতেছিল। গাছ দুইটার পাশে কয়েকটী আমলকী গাছ, গাছের পাতাগুলি ধীর বাতাসে নাচিতেছিল। প্রভাত কহিল—"ভগবানের সৃষ্টির মাধুরী দেখলে মানুষের মন পৃথিবীর সব সংকীর্ণতা ভুলে যায়, এই উদার অনন্ত আকাশ—আর এই দিগন্ত নিলীন শ্যামরূপের মাধুরী প্রাণে কতই না আনন্দ দেয়।"

পাহাড়ের শান্ত শীতল বাতাস ধীরে ধীরে গাছের পাতা কাঁপাইয়া ঝির ঝির করিয়া বহিতেছিল। দুইজনে পাশাপাশি বসিয়াছিল—বাতাসে প্রভার কাপড়ের খানিকটা উড়িয়া প্রভাতের গায়ের উপর আসিয়া পড়িতেছিল, প্রভাতের উড়ানিখানার কতকটা মাটিতে ও কতকটা প্রভার গায়ে গিয়া পড়িয়াছিল।

বেলা তখন বারোটা। তাঁবুর পাশে ঝন্নার ধুম লাগিয়া গিয়াছে—দুই তিনজন বাবুর্চ্চি ও খানসামা পাকের তদ্বির করিতেছে। বীণা ও

অনীতা প্রপাতের ঠিক্ নীচে একখানা শিলার আসনে বসিয়া পা দু'টী জলে ডুবাইয়া কখন হাত জলের স্রোতে ডুবাইয়া অবিরাম হাস্যকলরবে আনন্দ মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। মিসেস্ চৌধুরী যতীন্‌কে কহিলেন—"প্রভা, দেখ্‌ছি প্রভাতকে জড়াবার চেষ্টা কচ্চে। দেখ্‌ছিস্ দু'জনে কোথায় গিয়ে চুপ্ করে বসে গল্প কচ্চে। আমরা এত সব লোক যেন কেউ নই।"

মায়ের এই ইঙ্গিতটুকু যতীনের প্রাণে হঠাৎ আঘাত করিল—"সে কিছু নয় মা, মিঃ রায়েরত এখানে কেউ আলাপী নেই, বিশেষ ওঁদের বাড়ীর গেষ্ট. কাজেই মিস্ রায়ের সঙ্গে আলাপ করা সম্ভবপর। আর কিছু নয়."

মিসেস্ চৌধুরী হাসিয়া কহিলেন—"এ সম্ভব। আচ্ছা, তা বলে কি একটু ভদ্রতাও থাক্‌তে নেই। societyতে মিশ্‌তে হলে সকলের মন রেখে চলাই নিয়ম।'

"তাত নিশ্চয়। কি বল মা, আমি ওঁদের ডেকে আন্‌বো কি ?"

"না—না—ওরা যেন এটিকেট জানেন না, তাবলে আমরা কি এটিকেট ভুলে যেতে পারি। আর এদিকে রান্নাও ত প্রায় হয়ে এল। তুই আর একটু দেখে ওদিকে বরং একবার যাস্।

দুপুরের স্তব্ধ গভীরতার মধ্যে কতকগুলি পাখী গান গাহিতেছিল। সেই গভীর প্রপাতের শব্দের মধ্যেও তাহাদের সেই মিষ্টি সুর কণ্ঠে সুধা ঢালিয়া দিতেছিল।

প্রভার মনে হইতেছিল—কেন প্রভাতের কাছ ছাড়িয়া যাইতে তাহার প্রাণ চাহে না, তাহার কথা. তাহার সঙ্গ কেন তাহার হৃদয়ে একটা অভিনব পুলক আবেশ জাগাইয়া দেয়। দুইজনে খানিকক্ষণ নীরবে বসিয়াছিল—হঠাৎ প্রভাত কহিল—"মিস্ রায় আমার একটা অনুরোধ রাখবেন কি ?"

প্রভা হাসিয়া কহিল—"কি অনুরোধ আপনার ?

প্রভাতের কণ্ঠ হইতে যেন কোন কথা বাহির হইবার সুযোগ পাইতেছিল না, সে কম্পিত সুরে কহিল—"জানিনা, আমি আপনাকে আঘাত দিচ্ছি কি না, যদি আপনি, আমার সহিত পত্র বিনিময়ের অনুমতি দেন তাহলে একান্ত চরিতার্থ হব।"

প্রভা হাসিয়া কহিল—"আমি ভেবেছিলুম, না জানি কি ওয়াটারলু যুদ্ধ বেধে গেল। এ আবার অনুমতি কেন ? আপনার বাবার সহিত আমার বাবার যে বন্ধুত্ব আপনাকে আমাদের ন্যায় দীন পরিবারে এনে উপস্থিত করেছে, সে কি আমাদের সৌভাগ্য নয় ? আপনি যখন যেখানে যেভাবে থাকেন, আমায় সংবাদ দিলে আনন্দিত হব।"

প্রভাতের মুখে যেন একটা আনন্দ-শ্রী ফুটিয়া উঠিল। সে এতক্ষণ লক্ষ্য করে নাই, হঠাৎ নীচের দিকে চাহিতে দেখিল, তাহারা যে ক্ষুদ্র শিলার উপর বসিয়াছে, তাহার পাশে একটি ক্ষুদ্র বনফুলের ঝোপে দুইটা বড় সুন্দর লাল রঙের ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে ; দুই জনে এক সঙ্গেই উহা তুলিবার জন্য হাত বাড়াইতে যাইয়া প্রভার করপল্লব প্রভাতের মুঠির মধ্যে ধরা পড়িয়া গেল। প্রভাত খানিকক্ষণ তাহা চাপিয়া রাখিল, ছাড়িতে পারিল না—প্রভাও ছাড়াইয়া লইতে কোন চেষ্টা করিল না—কিন্তু তাহার গালে কে যেন ফাগুয়ার আবিরের লালিমা ফুটাইয়া তুলিয়াছিল।

এমন সময় পশ্চাৎ হইতে যতীন্ কহিল—"মিঃ রায়, মিস্ রায়, খানা প্রস্তুত, আপনাদের জন্য যে সব বসে রয়েছেন।" প্রভাত ও প্রভা হঠাৎ এই আহ্বান-বাণীতে চমকিয়া উঠিল—প্রভাত ত্রস্তে দাঁড়াইয়া কহিল—"চলুন মিস্ রায়, উঃ আমরা এই স্তব্ধতার মাঝখানে কোন দিকে লক্ষ্য করিবার সুযোগ পাই নি। চলুন মিঃ চৌধুরী।" যতীন্ মিসেস্ চৌধুরীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া—প্রভাত ও প্রভা যে শিলাস্তূপের

উপর বসিয়াছিল সেদিকে অগ্রসর হইল। তাহার মাতা প্রভার প্রতি যে ইঙ্গিতটুকু করিয়াছিলেন, যতীনের মনে হইল তাহাও ত অসম্ভব নয়। যে দেবীর মোহিনী ছবি বুকে লইয়া সে আশায় আশায় সময় কাটাইতেছে, সে কিনা অবশেষে তাহার আকাঙ্ক্ষার আবেষ্টনীর মধ্য হইতে দূরে পালাইবে। সে কখনও হইতে পারে না। যতীন্ পশ্চাতে আসিয়া যখন দাঁড়াইল—তখন প্রভাতের মুষ্টির ভিতর প্রভার কোমল কর-পদ্ম বাঁধা পড়িয়া গিয়াছে। যতীনের চক্ষু দুইটী এই দৃশ্যে ঈর্ষার তুমুল বিপ্লবে বিদ্রোহী হইয়া রক্ত-জবার মত লাল হইয়া উঠিয়াছিল। ক্রোধে নাশারন্ধ্র হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছিল। কিন্তু যতীন্ হৃদয়ের সব বিদ্রোহ ভাবগুলি চাপা দিয়া মুখে কৃত্রিম হাস্য ফুটাইয়া উভয়কে আহ্বান করিল। ক্যাম্পে যাইবার পথে কেহ কোন কথা বলিল না। একটী ছোট নালা পার হইবার সময় যতীন্ কহিল—"মিস্ রায়, আপনাকে আমি এখানে একটু সাহায্য করবো কি ?"

মিস্ রায় কহিল—"ধন্যবাদ—না—না—কোন দরকার হবে না।" এ সময়ে হঠাৎ প্রভাত আসিয়া প্রভার বাহু ধরিয়া অতি সন্তর্পনের সহিত প্রভাকে সেই ক্ষুদ্র নালা পার করাইয়া দিল। যতীন্ হাসিল—কিন্তু কোন কথা বলিল না।

মানুষের ভালবাসা—ক্ষোভ ও দুঃখ, হর্ষ বা বিষাদের চিত্র সকল সময়ে বাক্যে প্রকাশ পায় না, তাহা তাহাদের মূল অভিনয়েই প্রকাশ পায়। তোমার মনের ভাব যতই গোপন করিয়া রাখ না কেন তাহা মুখের রেখায়, নয়নের বিচিত্র ভঙ্গিতে ফুটিয়া উঠিবেই।

প্রভাত ও প্রভা কাহারও নিকট কোন কথা বলে নাই, কিন্তু তাহাদের আচরণে মিসেস্ চৌধুরীর ন্যায় সুচতুরা রমণীর মনের মধ্যে সন্দেহের একটা কালো ছায়া আপনা হইতেই আসিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তিনি

দক্ষ কর্ণধার,—যে তরী লইয়া তাহাকে তীরে পঁহুছিতে হইবে, তাহার হাল এই সামান্য তরঙ্গাভিঘাতে ছাড়িয়া দিবার মত দৌর্ব্বল্য তাহার ছিল না। বরং তাহার উৎসাহ বাড়িয়া গেল। যেখানে একটা পরাজয়ের আশঙ্কা থাকে, সেখানেই বীর-পুরুষের যুদ্ধের স্পৃহা আরও জাগিয়া উঠে, এ ক্ষেত্রেও তদ্রূপ। বর্ত্তমান সমাজে—শুধু হিন্দু-সমাজে নয়, প্রত্যেক সমাজেই কন্যা-বিবাহের সমস্যা যে দিন দিনই কঠোরতম হইয়া উঠিয়াছে তাহা কন্যার অভিভাবকেরাই বিশেষ করিয়া বুঝিয়া আসিতেছেন। তবু বিরাট হিন্দু-সমাজের মধ্যে ছেলের অভাব হয় না কিন্তু ব্রাহ্ম-সমাজে মেয়েদের সংখ্যাও যেমন বেশী, শিক্ষিতাও তাঁহারা তেমনই বেশী, তাহাদের তুলনায় ছেলের সংখ্যাও যেমন কম, লেখাপড়ার দিকেও তাহারা তেমনই পশ্চাৎপদ, কাজেই বহুস্থলে হিন্দু-সমাজের ভাল ছেলেদের দিকে ব্রাহ্ম-সমাজের ধনী সম্প্রদায়ের লুব্ধ দৃষ্টি সদাই লাগিয়া থাকে। মিসেস চৌধুরী—প্রভার প্রতি প্রভাতের একটু অধিক মেলা মেশা খুব অস্বাভাবিক মনে না করিলেও খুব সরলভাবে তাহা গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

উশ্রীপ্রপাত হইতে ফিরিয়া আসিবার পথে তিনি অনীতা, প্রভাত ও প্রভাকে এক গাড়ীতে তুলিয়া দিয়াছিলেন। যতীন্ চারিদিক গুছাইবার ভার লইয়া একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও তাহাদের সহগামী হইতে পারে নাই। অনীতা—এইরূপ ভাবে প্রভাতের সঙ্গে এক গাড়ীতে আসিতে যেন কুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিলে প্রভাত কহিল—"আপনারা অনেক দিন গিড়িডিতে আছেন, কাজেই এখানকার সৌন্দর্য্য বাহিরের লোকের চোখে যত বেশী পড়ে আপনাদের চক্ষে তত বেশী পড়ে না!—কেমন?" প্রভা কোন উত্তর করিল না,—সে নীরবে দক্ষিণ দিকের মহুয়া বনের দিকে চাহিয়াছিল। মহুয়া ফুলের গন্ধে একটা মাদকতা

আছে, সাদা সাদা ছোট ফুলগুলি গাছের তলায় প্রচুর পরিমাণে পড়িয়া আছে,—রাখাল-বালকেরা তাহা কুড়াইয়া স্তূপীকৃত করিতেছে। প্রভাকে নিরুত্তর দেখিয়া অনীতা কহিল—"সে কথা ঠিক্—কারণ প্রদীপের কোলেই অন্ধকার বেশ গভীরভাবে অন্ধকার করিয়া ফেলে,—এ আমাদের রোজকার দেখা কি না, তাই তেমন চোখে পড়ে না।"

প্রভাত এই মেয়েটীর সহিত মনে মনে একবার প্রভার রূপের তুলনা করিয়া লইল। অনীতার উজ্জ্বল গৌরবর্ণের দেহের উপর ও মুখে যেন একটা বিলাসভঙ্গী ও অহঙ্কারের দীপ্ত গরিমা ফুটিয়া বাহির হইতে-ছিল—আর প্রভার রূপ সন্ধ্যাতারার ন্যায় শান্ত ও উজ্জ্বল—স্নেহ ও প্রেমে শুভ্র নির্ম্মল শতদলের ন্যায় অনিন্দ্য মাধুরীতে ফুটিয়া রহিয়াছে। একজন যেন বাহিরের দিক্ হইতে আচ্ছন্ন করিতে চাহে—আর একজন যেন হৃদয়ের অভ্যন্তরের পরিপূর্ণ মধু-ভাণ্ডারের অধিকারী হইয়াও আপনাকে প্রকাশ করিতে চাহে না।

পথে আর বেশী কোন কথা হইল না। সন্ধ্যায় অলস-মন্থর মৌন অন্ধকার রাশি যখন ধীরে ধীরে ধরণীকে ঢাকিয়া ফেলিবার উদ্যোগ করিতেছিল —ঠিক্ সেই সময়ে তাহারা গিরিডি পঁহুছিল। অনীতা—প্রভা ও প্রভাতকে তাহাদের বাড়ীতে পঁহুছাইয়া দিয়া নিজ বাড়ীতে চলিয়া গেল।

১৪

প্রভাতের ব্যবসায়ের দিকের যাহা কিছু করিবার ছিল তাহা সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রবীণ ব্যবসায়ী মিঃ চৌধুরীও তাহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছিলেন। প্রপাত দেখিয়া আসার পর যে, আর দু' চারিদিন গিরিডিতে ছিল,সে কয়দিন সন্ধ্যার সময় প্রায় প্রত্যহই মিঃ চৌধুরীর বাড়ী হইতে নিমন্ত্রণ আসিত। এই নিমন্ত্রণের একটা বিচিত্র বিধান সে প্রায়ই লক্ষ্য করিত—প্রায় প্রতিদিনই অনীতা তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইত

তাহারা দুইজনে বহুক্ষণ গল্প করিবার পর একে একে মিসেস্ চৌধুরী ও যতীন্ ও মিঃ চৌধুরী আসিয়া খাবার টেবিলে উপস্থিত হইতেন। এই ভাবে এই দু' চারি দিনের মধ্যেই অনীতার সহিত প্রভাতের অনেকটা পরিচয় হইয়া গিয়াছিল। অনীতা প্রতিদিন নিত্য নবীন বেশভূষায় সজ্জিতা হইয়া প্রভাতের জন্য অপেক্ষা করিত—এইরূপ নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করাও চলেনা—অথচ প্রত্যহই এইরূপ ভাবে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গেলে লোকের যে কথা কহিবার নানা সুযোগ ঘটে তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। সূর্য্যমল ঝুন্ ঝুনওয়ালা মাড়োয়ারীর ছেলে, সংসারে সে ব্যবসায়ের চেয়ে বড় কোন জিনিসই দেখিত না—সে এক দিন প্রভাতকে কহিল—"দেখুন, মিঃ বসু রায়! মিঃ চৌধুরী এখানকার কয়লা ও আভের কারবারটা একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছেন, আর ব্যবসায়ে চৌধুরী পাকা মানুষ, ওকে হাতকরা দরকার, সেদিকে লক্ষ রাখবেন,।" তারপর ঝুন্ ঝুনিওয়ালা যখন দেখিতে পাইল যে প্রভাতকে মিঃ চোধুরী একটু অতিরিক্ত স্নেহের চক্ষেই দেখিতেন, তখন ঝুন্ ঝুন্ওয়ালা স্থির করিল যে এখানকার কার্য্যের সাফল্য সম্বন্ধে তাহার নিশ্চিত হইবার পক্ষে কোনও বাধা নাই।

অনীতার সঙ্কোচটা এখন অন্তর্হিত হইয়াছে,—এখন আর প্রভাতের সহিত কথা বার্ত্তা বলিতে তাহার গাল লাল হইয়া উঠিত না, কথা আটকাইত না, সে সহপাঠিনীদের সঙ্গে যেমন সরল সহজ ভাবে অজস্র কথা বলিয়া যাইতে পারিত, প্রভাতের কাছেও এখন তেমনি ভাবে নানা কথা কহিত। অনীতার আলাপ—প্রভাতের কাছেও মন্দ লাগিতনা। এদিকে প্রভাতের যাওয়ার দিনও স্থির হইয়াছে আর এক দিন পরেই সে কলিকাতা হইয়া দেশে চলিয়া যাইবে। সে দিন অপরাহ্নে চা খাওয়ার নিমন্ত্রণ উপলক্ষে প্রভাত তাহাদের বাড়ী আসিয়াছে।

গ্রীষ্মের অপরাহ্ণে ঠাণ্ডা বাতাসটা পরম রমণীয় বোধ হইতেছে—সূর্য্যের শেষে লোহিত রশ্মি ধূম্রধূসর পরেশ নাথ পাহাড়ের চূড়ায় পড়িয়া এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে, লাল মেঘের গায়ে কত পাহাড়, কত নদী—কত বন-উপবনের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রভাতের পেয়ালায় চা ঢালিতে ঢালিতে অনীতা মৃদুস্বরে কহিল—"কাল কি আপনি চলে যাবেন, মিঃ বসু ?"

প্রভাত কহিল—"হ্যাঁ, অনেকদিন আপনাদের এখানে কাটিয়ে গেলুম, ভেবেছিলুম, দু' চার দিনেই কাজ সেরে যেতে পারবো, কিন্তু আপনাদের এখানকার বন্ধনটা সহজে মুক্তি দিলনা। মিঃ চৌধুরী আমার কার্য্যের খুব সাহায্য করেছেন, তাঁর কাছে আমি চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকবো। আর আপনার ও মিসেস চৌধুরীর দয়া—সেত বলে প্রকাশ করা চলেনা, মিস্ চৌধুরী।" "তা, আবার কতদিনে ফিরে আসবেন ?"

"যায়গা নেওয়া ঠিক্ হয়েছে, এখন কোম্পানী রেজেষ্টরী করে গুছিয়ে নিতেও কতক দিন যাবে, তার পর, দেশের বাড়ীতেও একবার যেতে হবে, সবদিক গুছিয়ে গাছিয়ে তিন চারি মাসের আগে যে ফিরে আসতে পারবো, সেত মনে হয় না।"

অনীতা একটি ছোট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল—"এতদিনে বোধ হয় আমাদের ভুলে যাবেন।" তখন সূর্য্য খণ্ডোলি পাহাড়ের পশ্চাতে অর্দ্ধেকখানা ডুবিয়া গিয়াছে, শেষ রশ্মির লালিমা আসিয়া অনীতার সুগৌর মুখের উপর পড়াতে মুখখানা আপেলের মত লাল হইয়াছিল, শুভ্র পরিচ্ছদ পরিহিতা তরুণীর সুঠাম দেহের উপর কে যেন প্রচুর পরিমাণে আবির ঢালিয়া দিয়াছিল। সুরভি সিক্ত কুন্তলগুচ্ছ উড়িয়া উড়িয়া কাঁধের দুই পার্শ্বে সর্প শিশুর নৃত্যের মত হেলিয়া দুলিয়া নাচিতেছিল। প্রভাত তন্ময় হইয়া সেই ছবিখানি দেখিতেছিল, তাই অনীতার শেষ কথাটির উত্তর দিতে ভুল হইয়া গিয়াছিল—প্রভাতের এই তন্ময় ভাবটুকু সুচতুরা অনীতার দৃষ্টি

এড়ায় নাই। সে হাসিয়া কহিল—"কি ভাবছেন, মিঃ বসু!" প্রভাত চমকিয়া স্বপ্নোত্থিতের মত কহিল "না-না-কিছু না, এই যে আপনাদের ছেড়ে যেতে প্রাণটা কেমন অবসন্ন হয়ে পড়ছে। ভাব্‌ছি-মানুষের মন কত বড় দুর্ব্বল, কখন কি ভাবে আপনাকে হারিয়ে ফেলে। আপনাদের এই স্নেহ, এই উদার প্রীতির ভাব কেমন একটা অজ্ঞাত আকর্ষণে বেঁধে ফেলেছে যে, যেতে হবে, সেকথা মনে কর্‌তেও কষ্ট হচ্চে।"

অনীতা প্রস্ফুটিত মল্লিকা ফুলের ন্যায় সুন্দর হাসি হাসিয়া কহিল "তবে, আমাদের একেবারে ভুলে যাবেননা বোধ হয়, কল্‌কাতায় গিয়ে আবার কত সুহৃদ, বন্ধু পাবেন কত শিক্ষিতা মহিলাদের সঙ্গে মিশ্‌বেন, তখন কি আর আমাদের মনে করবেন মিঃ রায়?"

"একথা বলে আমায় লজ্জা দিবেন না, আমি এত বড় অপদার্থ নই যে, আপনাদের ভুলে যাব। আমাকে দেখে কি আপনার তাই মনে হচ্চে নাকি!"

অনীতা কোন কথা কহিল না। এই সময় মিসেস্ চৌধুরী সেখানে আসিলেন। প্রভাত তাড়াতাড়ি উঠিয়া মিসেস্ চৌধুরীকে অভ্যর্থনা করিতে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন—"বস, বাবা বোস। শুনলুম, তুমি কালই চলে যাচ্ছ। কি যেন, তোমার উপর ওঁর কেমন একটা স্নেহ পড়ে গেছে, সর্ব্বদা তোমার কথাই বলেন। তা বাবা, আবার গিরিডি কবে আস্‌বে?"

প্রভাত কহিল—"তিন চার মাসের ভেতরই ফিরে আস্‌বো। কাজ-কর্ম্ম বোধ হয় এখানেই কর্‌তে হবে।"

"উনি বল্‌ছিলেন, তুমি সরকারি চাকরি পেয়েছিলে, তা করতে চাইছ না, কেন, ঠিক্ কি?"

"হাঁ, আমার বরাবর পণ, নিজের পায়ে ভর করে দাঁড়াব। স্বাধীন

ভাবে একটা কিছু করে তোলায় যে আনন্দ আছে, চাকরীর ঘূর্ণপাকের ভেতর হুকুম তামিল করে তা হয় না। তারপর আমাদের শক্তি কতটুকু, আমরা সেদিকে দেখবারও অনেকটা সুযোগ পাই। এই দেখুন না মিঃ চৌধুরী যদি চাকরী করতেন, তাহলে কখনো এত বড় হতে পারতেন না। আজ তিনি একটা ব্যবসায়ের মালিক হয়েছেন বলেইত হাজার হাজার লোক দু'মুঠো ভাত পাচ্ছে। আমাদের জাত যদি বর্ত্তমান এই অন্নসমস্যার মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়াতে চায় তাহলে আমাদের নিজহাতে চাষবাস, শিল্পবাণিজ্য তৈরী করে নিতে হবে। শুধু শুধু কয়েক চাকরীর পেছনে দৌড়ান আমিত কোন মতেই সমর্থন করি না। ধরুন না চাকরী করে বড জোর তিন হাজার টাকাই মাইনে হত, কিন্তু এই যে ব্যবসা করবার যোগাড় যন্ত্র কচ্চি, যদি এ ব্যাপারে সাফল্য লাভ করতে পারি, তা হলে এর চেয়ে ঢের বেশী টাকা রোজগার করতে পারবো, শত শত লোক প্রতিপালিত হবে, দেশেরও একটা কাজ হবে। ঠিক কিনা বলুন ত ?"

মিসেস চৌধুরী এই তরুণের উৎসাহপূর্ণ বাক্য শুনিয়া বিশেষ তাহার স্বামীর প্রশংসায় পরম প্রীতিলাভ করিয়া আনন্দের সহিত গদ্ গদ্ কণ্ঠে কহিলেন—"ওঁরও তাই মত, একদম গোলাম হওয়া অপেক্ষা স্বাধীনভাবে যদি দু'মুঠো মোটা ভাতও জোটে সেও যে ঢের বেশী মূল্য বাবা! তুমি ওদিকের সব কাজ কর্ম্ম গুছিয়ে চলে এস, আমরা যতদূর পারি তোমায় সাহায্য করবো।"

অনীতা কহিল—"পুরুষ যদি পুরুষের মত আদর্শ নিয়ে পড়ে উঠে, তবে সমাজের মেয়েরাও সেদিকে চলতে পারে। তবে কি না ত্যাগ ও আদর্শ চাই।"

মিসেস্ চৌধুরী বলিতে লাগিলেন—"আমিও অনীতাকে সেই শিক্ষাই

দিয়েছি, একদিকে সে যেমন সভ্য ও শিক্ষিতা সমাজে মিশ্‌বার উপযোগী হয়েছে, তেমনি গৃহস্থালীর সব কাজই তাকে শিখিয়েছি, মোটা ভাত মোটা কাপড়ে মানিয়ে নিবার উপযোগী শিক্ষাও তার আছে। আমাদের ত বাবা চিরদিন এ অবস্থা ছিল না, এমন দিন গেছে, যখন আমি নিজে এক হাতে সব করেছি—আজ না হয় বরং অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়েছে।"

অনীতা মাতার কথায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতেছিল,—প্রভাত এইবার দাঁড়াইয়া কহিল—"আজ তবে আসি। কাল যাবার সময় একবার দেখা করে যাব আপনাদের সঙ্গে।"

মিসেস্ চৌধুরী ও অনীতা দ্বার পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া প্রভাতকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া গেলেন। প্রভাত যাইতে যাইতে ভাবিল—"অনীতাকে বাইরের দিক থেকে দেখে যতটা অহঙ্কারী ও বিলাসী বলে মনে হয়, কই প্রকৃতপক্ষেত তা নয়! মানুষকে দেখ্‌ছি বাইরের দিক থেকে সব সময় বিচার করা চলে না। পাহাড়ের বন্ধুর কঠিন অঙ্গের ভিতর থেকেই যেমন স্বাদুনীরা নির্ঝরিণী বের হয়ে আসে—তেমনি অনীতার বাহ্যিক আবরণের মধ্যে যে একটী শিশির-ধৌত নির্ম্মল শতদলের মত মধুর ও কোমল মধুভরা একখানা হৃদয় আছে তাত কোন ক্রমেই বোঝা যাচ্ছিল না।"

মানুষ বাইরে যতই কেন গুণের পক্ষপাতী হইয়া তর্কযুদ্ধ করুক না কেন, মনে মনে সে যে রূপের উপাসক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। প্রভা ও অনীতা দুই জনেই সুন্দরী—একজন উজ্জ্বল তপনের মত রূপ-প্রভাশালিনী আর একজন শান্ত স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার মত শান্তি-সুধা প্রদায়িনী। এই এক সপ্তাহের মধ্যেই প্রভাতের হৃদয়ে একটা বিপ্লব বাধিয়া গিয়াছে—পূর্ব্বে এমনভাবে কোন তরুণীর সঙ্গে মিলিবার সুযোগ তাহার হয় নাই।

বুদ্ধিমতী ও বহুদর্শিনী মিসেস চৌধুরী মাকড়শার জালের মত অতি সূক্ষ্মভাবে প্রভাতের চারিদিকে যে জাল বুনিতেছিলেন তাহা প্রভাত জালরূপ উপলব্ধি করিতে পারে নাই, করা সম্ভবপরও নয়, জীবন-বসন্তে যৌবনের উন্মাদনায় যখন রমণীরূপের মাধুরীর মায়াজাল পুরুষের মন-বিহঙ্গকে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য মদনের নিপুণ পুষ্পশরের কৌশলি সন্ধানে ছড়াইয়া পড়ে, তখন তাহার হাত এড়ান যে খুব সহজ তাহা নহে। সুন্দরী তরুণীর নিপুণ রস-কটাক্ষ, মদিরতা ভরা হাস, শত কোটি জয়ধ্বনি লাঞ্ছিত করিয়া মধুর ভাষা—শুনিবার জন্য কোন্ বিলাসী তরুণের চিত্ত না বিচলিত হইয়া উঠে?

প্রভাত যাহা ভাবে নাই—তাহাই তাহাকে ভাবিতে হইতেছিল। প্রভাত বিবাহের বিরুদ্ধে মনে মনে যে পণ করিতেছিল—তাহা ঠিক্ যেন বৃন্তচ্যুত পুষ্পের ন্যায় বাতাসের ভরে উন্মুখ ব্যাগ্র হইয়া অলখ্য পথে ভাসিয়া বেড়াইবার জন্য উদগ্র আকাঙ্ক্ষায় উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিল।

১৫

প্রভা প্রভাতের পরিবর্ত্তন লক্ষ করিতেছিল। এই পরিবর্ত্তন—নারী যত সহজে বুঝিতে পারে, পুরুষ তত সহজে পারে না। সেদিন পূর্ণিমা—আকাশ ভরা জ্যোছনা। জ্যোৎস্নার মধ্যে কত কথা মনে পড়ে। কবে কোন্ পূর্ণিমা রাত্রির মধুর আলোকে, বেবার কলোচ্ছ্বাসের মধ্যে কত মদনিকা চিত্র লেখার অভিসার সজ্জা ব্যর্থ গিয়াছে আজিকার এই রাত্রিও যেন তাহারি সাক্ষী। মহাশ্বেতার বিরহ-ব্যথা এমনি মধুঢালা জ্যোছনায়ই না প্রিয়তম পুণ্ডরীকের জন্য হাহুতাশ করিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছিল। দূরে কোথায় যমুনার তীরে—নীপ তরুমূলে মধুর মুরলী লইয়া চতুর বনমালী বাঁশীর স্বরে কাহাকে ডাকিতেছে। শিরিষ ফুটিয়াছে,

নব মল্লিকা হাসিয়া ঝরিতেছে, মলয় ব্যর্থ বেদনার হাহাকার ধ্বনি জাগাইয়া কাহাকে যেন ডাকিতেছে 'ওগো! এস! ওগো! এস! সে যে তোমার অপেক্ষায় তোমারি আশায় পল গণিতেছে। বাঁশী বাজিতেছে—সাহানার বেহাগে বাঁশী বাজিতেছে! উন্মনা রাধিকার চঞ্চল মন বাধা মানিতেছে না—সে যে তাহার আরাধ্যের কাছে ছুটিয়া যাইতেছে—এমন মধুর চাঁদিনী রাতি, এমন সুন্দর নীলতরুকুঞ্জ—এমন মধুর যমুনা—নীলদলে রজত ধারা পড়িয়া নীলে রজতে মধুর মিলন, চরণ ছুঁইয়া যমুনা আনন্দে লহর বাহু বাড়াইয়া তীর চুম্বন করিয়া আবার ফিরিয়া যাইতেছে। পরপারে মণিমাখা তরু ছবি শান্ত নিবিড় ঘুমঘোরে আচ্ছন্ন। বাঁশী বাজিতেছে—এত আবেগ—এত করুণ বিরহ-সুর-ঝঙ্কার কি আর প্রিয়তমার চঞ্চল মন পাগল না করিয়া থাকিতে পারে? রাধা পাগলিনী—রাধা বিরহিনী—রাধা অভিসারিণী—রাধা প্রিয়জনসমাগমাভিলাষিণী ছুটিয়া আসিয়া প্রিয়তমের বাহু নিলীন হইল। এইবার আবার বাঁশী বাজিল, এ বাঁশীর রব প্রেমের বিজয় বাণী ঘোষণা করিল। প্রেমের জয় হইল। প্রভাত বাড়ী ফিরিয়া দেখিল, প্রভা বাহিরে বাগানের মধ্যে একটী ছোট শিলার উপর বসিয়া আছে। তাহার খোলা চুল বাতাসে উড়িতেছে—অঞ্চল মাটিতে লোটাইতেছে। প্রভাতের মনের উপর তখনও অতীতের মধুর রূপ-লহরী নাচিয়া বেড়াইতেছিল। সে প্রভাকে ঐরূপভাবে বাগানে একাকিনী দেখিতে পাইয়া কহিল—"একা চুপ করে বসে রয়েছেন যে, বীণা কোথায়?"

প্রভা তাড়াতাড়ি বসন সংযত করিয়া কহিল—"তবু ভাল, আমাদের কথা মনে পড়েছে, একেবারে যে" কি যেন একটা বিক্ষোভের বাণী তাহার মুখ হইতে আকস্মিক ভাবে বাহির হইয়া যাইতেছিল, সে ত্রস্তে তাহা সংযত করিয়া কহিল—"বীণার কথা বলছেন? সে সঙ্গীতশাস্ত্রের সঙ্গে রীতিমত লড়াই করতে সুরু-করে দিয়েছে।"

"আপনার বাবা কোথায় ?"

"তিনি এখনও ফেরেন নি। উঃ আজ কি গরমটাই পড়েছিল। পৃথিবী যেন দগ্ধ হয়ে গেছে। তাই বাইরে বসে একটু হাওয়া খাচ্ছি, রাত্রির এই নীরবতা ও শান্ত স্নিগ্ধ ভাবটুকু আমার বড় ভাল লাগে।"

"সে কথা ঠিক্। পুরুষের মন যে কতভাবে দোলা খায় তাহার ইতিহাস বোঝা বড় সোজা নয়। প্রভার এই স্নিগ্ধ শান্তভাবটুকু প্রভাতের মনে পূর্ব হইতেই একটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। পলকমধ্যে মনের এইরূপ পরিবর্তন স্বাভাবিক কি অস্বাভাবিক তাহা কে বলিবে ? তবে প্রণয়ের ইতিহাসে চিরদিন যাহা অস্বাভাবিক তাহাই স্বাভাবিক হইয়া থাকে।

প্রভাও প্রভাতের পাশে বসিবার আসনের মত একটী ছোট পাথর অবস্থিত ছিল, সেখানে বসিয়া কহিল—"দেখুন মিস্ রায়, চামেলি ফুল ক্ষুদ্র কিন্তু বড় সুন্দর।

"প্রভা, প্রভাতের দিকে মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া কহিল—"ক্ষুদ্র হলেই সে ভাল হয় না ?"

"না—সে কথা নয়। আমাদের দেশের ক্ষুদ্র চামেলি, বেলা ও নব মল্লিকা ও যুঁইর বুকে যে মধু সৌরভটুকু লুকান থাকে তার তুলনা কোন দেশের কোন ফুলে মিলে না।"

"তা ফুলের কথা এখন থাক্, আজ চায়ের টেবিলের গল্প বলুন না ?"

সেখানে আর কি গল্প হবে বলুন। মিসেস্ চৌধুরীর সঙ্গে কতকগুলি কাজের কথা হল। মিঃ চৌধুরী আমাদের জমি নেওয়ার জন্যে সাহায্য করেছিলেন, তাই তাঁকে ধন্যবাদ জানালুম। এই সব কথা।"

প্রভা হাসিয়া কহিল—"আমি ভেবেছিলুম, আপনাদের আজ খুব Romantic গল্প চল্‌ছিল।"

প্রভাতের মুখ সহসা মলিন হইয়া গেল। না—আর কি হবে।

"না হওয়া বিচিত্র কি?"

চন্দ্রকান্তবাবু সুধীরের কোন সংবাদ না পাইয়া ব্যস্ত ছিলেন, তার উপর যতীনের দ্বারা দুই এক মাসের মধ্যেই ডিভিডেণ্ড পাইবার আশায় যে পুরাণ গোল কোম্পানীর 'সেয়ার' কিনিয়াছিলেন, সে দিক হইতেও কোনও আশার সংবাদ না পাইয়া একটু অতিরিক্ত মাত্রায় চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এদিকে ঋণের মাত্রা সুদের সঙ্গে অস্বাভাবিক রকমে বৃদ্ধি পাইয়া তাঁহাকে গ্রাস করিবার জন্য চারিদিক হইতে বিকট বদনা রাক্ষসীর মত হাঁ করিয়া প্রত্যহ ছুটিয়া আসিতেছিল। ঋণের চিন্তা যে কত বড় দারুণ কত বড় ভীষণ সে কথা যিনি অঋণী তাঁহার পক্ষে কল্পনায়ও অনুভব করা সম্ভবপর নহে। কোন্ পথে কি ভাবে অগ্রসর হইলে এই দায়ের হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া যায় সে চিন্তাতেই দিবানিশি তাহার মন ব্যাকুল হইয়া পড়িত। প্রভাতের সঙ্গেও প্রথম প্রথম যেরূপ উৎসাহের সহিত গল্প করিতেন তাহাও হ্রাস পাইয়াছিল। দৈন্যের যে কঙ্কাল মূর্ত্তি বাহিরে কোনরূপ আবৃত রাখিয়াছিলেন, তাহাও আর চলে না। প্রভাতের কাছে সব খুলিয়া বলিবার জন্য তাহার বহুবার ইচ্ছা হইয়াছে, কিন্তু লজ্জায় তাহা পারেন নাই। প্রভাত স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিল যে তাহার উপযুক্তরূপ সম্বর্দ্ধনা বা আহারের আয়োজন করিতেও এই পরিবারের প্রত্যহ একটা চিন্তার কারণ হয়, অথচ সে যদি এখান হইতে চলিয়া যাইত তাহাও ইহাদের পক্ষে একান্ত অশোভন ও অগৌরবের কারণ হইয়া পড়ে, কাজেই মিঃ চৌধুরীর বাড়ীর নিমন্ত্রণটা সে কোনরূপেই হেলা করা সঙ্গত মনে করে নাই। দুরবস্থার চরম সীমায় আসিয়াও যখন—পিতা কোন মতেই প্রভাকে কোন কার্য্য গ্রহণ করিতে অনুমতি দিলেন না, তখন তাহার মন নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। সে যদি পুরুষ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিত তাহা হইলেও কোন কথা ছিল না।

প্রভা আজ একরাশ ভাবনা লইয়া যখন বড় নিঃসঙ্গ ও একাকী বোধ করিতেছিল তখনই সে বাহিরে আসিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিল। প্রভার মন বিষণ্ণ হইবার আর একটী কারণও ঘটিয়াছিল, সেদিন প্রভাতে ডাকের চিঠি আসিলে যখন সে সকলের মধ্যে সুধীরের কোনও চিঠি পাওয়া গেল না, তখন চন্দ্রকান্তবাবু তাহাকে কহিলেন—"ছেলেটাকে এমন করে যদি তুমি আঘাত না দিতে মা, তা হলে সে কখনও সৈন্যদলে যোগ দিত না।"

প্রভা তাহার প্রতি এই দোষের আরোপ খুব সংকুচিতভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই, সে কহিল,—"সে দোষ কি শুধু বাবা আমার, তাহার নয়?"

চন্দ্রকান্তবাবু ইহাতে গর্জ্জিয়া কহিলেন—"আমি যদি তাকে একবার একটা কটু কথা বলে মর্ম্মে আঘাত দিয়ে থাকি, তুমি তার চেয়ে ঢের বেশী আঘাত করে কথা কয়েচ, অভিমানী সে, এত আঘাত সইতে পার্‌লো না, তাই চলে গেল, আমিও তোমার ভয়ে জোর করে তাকে মানা করতে পারলুম না, ওরে তোর বুড়ো বাপকে ফেলে যাস্‌নে।" এই কথা কয়টি কহিতে যাইয়া তাহার সারা মুখের উপর অশ্রুর এমনি একটা বন্যা বাহিয়া গিয়াছিল যে, এত আঘাত ও আক্রমণের কথা পিতার মুখে শুনিয়াও সে আত্ম-সম্বরণ করিতে পারে নাই। এমনি নানা তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়া একটা দুর্ব্বিসহ অশান্তির ঝড় বুকে লইয়া আজ তাহার সারাটা দিন কাটিয়াছে। সম্প্রতি গিরিডির কোথাও সে বড় একটা বাহির হইত না, সেদিন প্রপাত দেখিতে গিয়াছিল শুধু সে প্রভাতের মনের দিকে চাহিয়া। মনে মনে যাহার প্রতি তাহার একটা শ্রদ্ধা বা প্রীতির ভাব বিকশিত হইয়া উঠিতেছিল—তাহা ফুলের কুঁড়ির প্রথম আবাসের মত হইলেও যে তাহার ভিতরে রূপে রসে ও সৌরভে পূর্ণ

বিকশিত হইবার শক্তি গুপ্ত ছিল, বাহির হইতে তাহা কে বুঝিবে? সারা জীবন ঘুরিয়াও কেহ কোন দিন জীবনের সঙ্গী খুঁজিয়া পায় না, আবার কেহ কেহ প্রথম দর্শনে এক নিমিষেই খুঁজিয়া পায়। দুষ্মন্তর তাহা হইয়াছিল, পুরুরাজার তাহা হইয়াছিল, পুণ্ডরীকেরও তাহাই ঘটিয়াছিল, এসব পুরাতন কথা ছাড়িয়া দিলেও প্রণয়ের নবীন ইতিহাসে যে অহরহ ঘটিতেছে তাহারও আমরা নিত্য সাক্ষী। প্রভাতের মনেও প্রভার এই সরল সহজ দৃপ্ত গতি ভঙ্গী ও বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানের প্রতিভামণ্ডিত সুশ্রী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল—যখন যে মুহূর্ত্তই সে নিশ্চন্ত মনে আপনার হৃদয়ের সন্ধান করিয়াছে সেখানে প্রভার মূর্ত্তি পাষাণে অঙ্কিত রেখার ন্যায় দৃঢ়—স্মৃতির ছবি যেন বিজলী রেখা। প্রভাত কহিল—"কাল ভোরের গাড়ীতেই যাব ঠিক করেছি।"

প্রভা চমকিয়া কহিল—"এত সকালে, কেন? আর দু'দিন কি থেকে যেতে পারেন না?"

"আর কত দিন আপনাদের বিব্রত করবো বলুন ত? অতিথির এত বেশী দিন থাকতে নেই।"

"উঃ তাই! বেশ। বাবাকে কাল সকালে যাওয়ার কথা বলেছেন ত?"

"বলিনি, কিন্তু আজ রাত্রিতেই বলবো।—কাজের যে বিরাট মন্দর পাহাড় রচনা করেছি, সেগুলো একে একে মাথা থেকে নামাতে হবে ত?"

প্রভা উঠিয়া দাঁড়াইল—তারপর দুইজনে পাশাপাশি পাইচারী করিতে করিতে কথোপকথন করিতে প্রবৃত্ত হইল। প্রভাত কহিল—"আপনাদের এখানে যে আনন্দ পেয়ে গেলুম—জীবনে কোনদিন তা ভুলবো না।"

"সে ভুল,—চোখের আড় হলেই মানুষ মনের বাহির হয়ে পড়ে।"

"সে অন্যের পক্ষে সম্ভব হলেও আমার কাছে নয় প্রভা। তুমি কি আমাকে এত বড়—আপনি কি—" হঠাৎ প্রভাকে তুমি বলিয়া যে সে কেমন করিয়া সম্বোধন করিয়া ফেলিল, তাহা সে যেন ভাবিয়াই ঠিক্ করিতে পারিল না, সেই ভুল সংশোধন করিতে যাইবার পূর্ব্বে প্রভা কহিল—"আপনি আমাকে তুমি বলেই সম্বোধন করবেন।" প্রভাত কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া কহিল—"প্রভা!"

প্রভা প্রভাতের দিকে মুখ তুলিয়া বলিল—কি?

"তুমি আমাকে—যদি আমাকে যোগ্য মনে কর, গ্রহণ করবে ত?"

প্রভা কোন কথা কহিল না—তাহার ওষ্ঠ দুটী কি যেন তৃষায় আন্দোলিত হইতেছিল—প্রভাত প্রভাকে আকুল আগ্রহে আকর্ষণ করিয়া রক্তিম কপোলে চুম্বন রেখা অঙ্কিত করিয়া দিল।

অদূরে তেমন সময় একটা মানুষের ছায়া বাগান হইতে সরিয়া গেল।

প্রভাত যাইবার সময় প্রভাকে কহিয়া গেল যে—নানা কাজের ঝঞ্ঝাট মিটাইতে আমার প্রায় এক বৎসর লাগিবে, এ সময়টা তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করিও।"

১৬

প্রভা সম্মত হইয়া কহিল—"বাবাকে এ কথাটা জানান কি উচিত নয়?"

প্রভাত কহিল—"হ্যাঁ। তারপর দুইজনে যখন একসঙ্গে যাইয়া চন্দ্রকান্তবাবুকে প্রণাম করিল, তখন তিনি প্রথমে কোন কথা বলিবার সুযোগ পাইলেন না, এ ব্যাপারটা তাহার কাছে যেমন আকস্মিক, তেমনি অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইল। তাই তিনি উভয়কে আশীর্ব্বাদ

করিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন—"তোমরা দু'জনেই উভয়ের অবস্থা বেশ ভাল করে ভেবে দেখেছ কি ?"

প্রভাত কহিল—"তেমন ভাববার কিছুই নেই। আমি প্রভার কাছে যে প্রার্থনা জানিয়েছিলুম, সেটা সফল হয়েছে।"

প্রভা কোন কথা কহিল না। সে নত মস্তকে বসিয়াছিল, তাহার মনেও যেন এইরূপ একটা ব্যাপার এত সহজে ও এত শীঘ্র হইতে চলিল দেখিয়া লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছিল। সে পিতার মুখের দিকে চাহিয়া কোন কথা বলিতে পারিতেছিল না। প্রভা সেদিন পিতার কাছে আঘাত পাইয়া দুইটী বিষয়ে চিন্তা করিতেছিল—হয় বিবাহ, নচেৎ আর পিতার ভার স্বরূপ হইয়া সে গিরিডিতে আর থাকিবে না। এই দুর্দ্দিনে, আর কতকাল সে দরিদ্র বৃদ্ধ পিতার স্কন্দে চাপিয়া নিশ্চিন্ত মনে অলস ভাবে দিন কাটাইবে। তারপর মতের প্রভেদে এখন মাঝে মাঝে যে তর্কের অগ্নিকণা ছিটকাইয়া প্রকটিত হইয়া পড়িতেছে, তাহা যে একদিন এই শান্তিময় ক্ষুদ্র পরিবারে অশান্তির প্রবল দাবানল সৃষ্টি করিবে না তাহাও ত নিঃসংশয়ে বলা যায় না। সন্তানের বুকে, বয়োবৃদ্ধির সহিত এমন করিয়া কত অভিমানই না জাগিয়া উঠে, স্নেহময় জনকের সব স্নেহ সব ক্লেশ তখন সন্তান ভুলিয়া যায়, এমনি ভাবে শিশু যখন বাল্যাবস্থা হইতে ধীরে ধীরে যৌবন-সীমায় পদার্পণ করিয়া কর্ম্মক্ষম হয়, তখন সে পিতামাতার প্রয়োজনের অপেক্ষা রাখে না। এই ভাবেই সংসার চলিয়া আসিতেছে। প্রভা তাহার পিতাকে যে শুধু ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত তাহা নয়, তাহার অতিরিক্তও সে কিছু করিত যাহা সাধারণতঃ সমাজে অধিকাংশ শিক্ষিতা মহিলাগণের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু সামান্য দুই একটী কথায় তাহার মন এইরূপ ভাবে বিদ্রোহী হইয়া উঠিবার মত কারণও তখন ঘটে নাই। ইদানীং চন্দ্রকান্তবাবু একটু বেশী

বয়সের খিট্‌খিটে হইয়া গিয়াছিলেন, অর্থের অভাব মানুষকে যে কত বড় হীন ও দরিদ্র করিয়া ফেলে তাহা উপলব্ধি ব্যতীত ভাষায় পরিস্ফুট হয় না। অর্থহীন ব্যক্তি দিন দিন সমাজের কাছে আপনাকে হেয় মনে করে—মনের সতেজ সাহসিকতা বিসর্জ্জন দেয়, প্রতি মুহূর্ত্ত পাওনাদারের পদশব্দের অস্বাভাবিক আশঙ্কায় সচকিত হইয়া উঠে। চন্দ্রকান্তবাবুর এখন সেই অবস্থা,—অর্থাভাব. অথচ প্রতিমুহূর্ত্তে অর্থের প্রয়োজন, যে সব কোম্পানির সেয়ারের টাকার লুব্ধ প্রত্যাশায় এতদিন কাটিয়া গেল, অথচ লাভের দিক্ হইতে এক পয়সাও ফিরিয়া পাইলেন না, তখন তাহার মন সম্পূর্ণ ব্যর্থতার ঘন ঘন আঘাতে একেবারে নিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। এখন একমাত্র কেবল সেয়ারের ভরসা। প্রভাত আসিবার পর হইতে তাহার মন আবার নবীন উৎসাহে পূর্ণ হইয়াছিল। আর যতীনের উৎসাহপূর্ণ বাক্যেও তাহার মনে আশার সঞ্চার হইয়াছিল। মনের ভিতর অশান্তির অনল দিবারাত্রি জাগাইয়া রাখিয়া বাহিরে হাসি প্রকাশ করা সকলের পক্ষে সহজ নহে। চন্দ্রকান্তবাবু এতদিন শত অশান্তি ও অভাবের মধ্যেও বাহিরের ঝড় ঝঞ্ঝা হাসিমুখে সহিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু সুধীর ঐরূপ ভাবে চলিয়া যাওয়ার পর তাহার হৃদয়ের সাহস অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছিল অথচ সেইরূপ হইবার যে বিশেষ কোন কারণ ঘটিয়াছিল তাহাও নহে। মোটের উপর একান্ত অশান্তির মধ্য দিয়াই আজকাল তাঁহার জীবন যাইতেছিল।

প্রভাতের কথা শুনিয়া চন্দ্রকান্তবাবু কহিলেন—“প্রভাত, তুমি রমণীর ছেলে, তোমার সহিত আমার কন্যার যদি বিবাহ হয় সে যে কত আনন্দের হবে, তা সহজেই বুঝতে পার, কিন্তু একটা কথা তোমাদের ভেবে দেখা উচিত, সেটা হচ্চে এই—তুমি কিছু মনে করোনা বাবা, তুমি হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত, আর আমরা শুধু ব্রাহ্ম বললেই হয় না, একেবারে

খাঁটী নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্ম, যে সময় ব্রাহ্ম সমাজের সবে মাত্র প্রথম প্রভাতের সূচনা হয়েছিল, সেই সময় হতেই আমরা সমাজের ভেতর আছি,—কাজেই তোমার বাবা কি হিন্দুসমাজে থেকে, বিনা আপত্তিতে তোমার সহিত আমার কন্যার বিবাহ দিতে সম্মত হবেন? যদি না হন, তা হলে তোমাদের এ মিলন হওয়া ত সম্ভাপর হবে না, তোমরা দু'জনেই আমার কথা কয়টী বেশ ভাল করে ভেবে দেখ। আর একটা কথা—প্রভার ও তোমার পরিচয়টা এই অল্প কয়েকদিনের মাত্র, কাজেই তোমাদের দিক্ দিয়েও বেশ গভীর ভাবে এ বিষয়টা ভেবে দেখা কি উচিত নয়? তোমাদের উভয়ের মন যদি এক হয়ে থাকে, তাহলে সময় বা সমাজ কিছুতেই তোমাদের দূর রাখতে পারবে না।"

প্রভাত বৃদ্ধের এই যুক্তিপূর্ণ কথার উত্তর তন্মুহূর্ত্তে দিতে পারিল না। খানিক নীরব থাকিয়া পরে কহিল—"আপনি যে কথা বল্লেন, আমিও এসব কথা গুলো ভেবে দেখেছি। আমি বিলেত ফেরত, হিন্দু-সমাজ বিনা তর্কে আমাকে গ্রহণ কর্‌বে, সে কথা ত আমার মনে হয় না, তার-পর আমি সকলের চেয়ে নিজের হৃদয়ের প্রেরণাকেই বড় করে দেখি। এজন্য যদি সমাজ, বা ধর্ম্ম আমাকে ছাড়তেও হয় তাতে আমি কুণ্ঠিত হব না। জীবনে যে কর্ত্তব্যকে আশ্রয় করে জীবন পথে অগ্রসর হতে চাই, আমি প্রভার মধ্যে সে আদর্শ দেখ্‌তে পেয়েছি। কাজেই আমার দিক্ থেকে যা বিবেচনা কর্‌বার তা করেছি। তবে আপনার মত আমি সকলের চেয়ে বড় মনে করি।"

প্রভা এতক্ষণ নীরবে ছিল, এইবার সে কহিল—"বাবা, আমি তোমার কথাই খুব ভাল বলে মনে কচ্চি, বেশত আমি অপেক্ষা কর্‌বো, যদি প্রভাত বাবু আমাকে গ্রহণ কর্‌বার যোগ্যা মনে করেন, তাহলে নিশ্চয়ই অপেক্ষা করবো।" প্রভা পিতার ব্যবহারে হৃদয়ে

যে আঘাত অনুভব করিয়া তীব্র বেদনা বোধ করিতেছিল একথা কয়টী কহিয়া তাহার প্রাণের সেই বিদ্রোহ ভাব যেন বহু পরিমাণে দূর হইল। প্রভাতের যে প্রস্তাবে সম্মতি জানাইতে তখন তাহার কোনও সঙ্কোচ হয় নাই, এক্ষণে যেন তাহাই তাহার কাছে পরম লজ্জার কারণ বলিয়া মনে হইতেছিল। প্রভাতও তাহা বেশ সহজ ভাবেই অনুভব করিতে পারিয়াছিল তাই সে হাসিয়া চন্দ্রকান্তবাবুকে সম্বোধন করিয়া কহিল—"আজ্ঞে আপনার ও বাবার অনুমতি পেলেও যে আমাদের বিবাহ এক বৎসরের পূর্ব্বে কোন মতেই সম্পন্ন হতে পারবে না সেকথা আমি প্রভাকে পূর্ব্বেই জানিয়েছি। কারণ আমি যে সব কাজ হাতে নিয়ে নেবেছি, সেগুলো একটু না গুছিয়ে কোন মতেই বিবাহ করতে পারবো না। আমি জানি প্রভার এ বিষয়ে কোন আপত্তি হবে না, শুধু আপনার মতের অপেক্ষায়ই কোন কথা বলিতে সাহসী হই নাই।" প্রভা স্পষ্ট বুঝিতে পারিল যে এ কথা কয়টী তাহার পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেও প্রকৃতপক্ষে তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইতেছে। সে মস্তক নত করিয়া মৃদুস্বরে তাহার অভিমত জানাইল।

চন্দ্রকান্তবাবু প্রভাতের কথা শুনিয়া কহিলেন—"তুমি আবার কবে পর্য্যন্ত এদিকে ফিরে আসবে ?"

"ঠিক্ বলতে পারি না,—কিন্তু দু'তিন মাসের মধ্যে যে একথা নিশ্চিত।"

"এ দু'মাস কোথায় থাকবে ?"

"কলকাতা ও দেশের বাড়ীতে।"

"বেশ, আমি ইতিমধ্যে রমণীকে চিঠি লিখবো। সে যদি মত দেয়, তাহলে আমার যে কত বড় আনন্দের বিষয় হবে, সে আর তোমাকে বেশী কি বলবো। জীবনে এ পর্য্যন্ত যে অশান্তির বোঝা সয়ে এসেছি,

ভগবানের ইচ্ছায় তোমাদের যদি এ মিলন হয় তাহলে সে অশান্তি অনেকটা ভুলতে পারবো।"

প্রভাত কহিল—"আশীর্ব্বাদ করুবেন, আপনার আশীর্ব্বাদ বাক্য যেন সফল হয়।" পরদিন প্রভাত কলিকাতা চলিয়া গেল।

প্রভার মন হইতে যখন পিতার প্রতি অভিমানের ভাবটা দূর হইয়া গেল, তখন সে আত্মগ্লানি অনুভব করিয়া সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল, কেন সে এত সহজে প্রভাতের কাছে আপনাকে ধরা দিল।

১৭

মহিমবাবুর অমতেও গ্রামের লোকেরা ও সাধারণ প্রজারা মিলিত হইয়া জমিদার পুত্রকে উপযুক্ত অভ্যর্থনা করিবার আয়োজনের কোন ক্রটি করিল না। স্কুলের ছেলেরা নিজ নিজ বাড়ী হইতে কলাগাছ কাটিয়া আনিয়া নদীতীর হইতে জমিদার বাড়ী পর্য্যন্ত উহা রোপন করিয়া মালা ঝুলাইয়া দিল। দেবদারু পাতা জড় করিয়া তোরণ সাজাইল, তাহার গায়ে ইংরেজীতে 'Welcome' এবং সংস্কৃতে 'স্বাগতম্' লিখিল। গান রচনা, গীত গাহিবার ব্যবস্থা ইত্যাদি বর্ত্তমান কালোচিত অভ্যর্থনার কোনরূপ ক্রটি হইল না। গোপাল সান্যাল এ সব বিষয়ের উদ্যোগী ছিলেন, তিনি এরূপ কোন একটা কাজ হাতের কাছে পাইলে আনন্দে উৎফুল্ল হইতেন। ষ্টীমার আসিবার সময়ে বহুলোক ষ্টেসনের কাছে যাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। প্রভাত তাহার ক্যাবিনের পাশে রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া দূর হইতে এই দৃশ্য দেখিতেছিল, তাহার মন আজ এক অপূর্ব্ব আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল—কতকাল পরে সে আজ মাতৃ-ভূমির বুকে ফিরিয়া আসিতেছে। এই সুন্দর দেশ-শস্যপূর্ণ সুন্দর চঞ্চল শ্যামল মাঠ, তাল-সুপারি-আম-নারিকেল প্রভৃতি নানা পরিচিত ফলবান-

গাছ পালা শোভিত সুন্দর পল্লীগ্রাম,—এই যে খালটী আঁকিয়া বাঁকিয়া নদী হইতে বাহির হইয়া দিগন্ত বিলীন গ্রামের মধ্যে যাইয়া মিশিয়াছে, এই খালের পারেই না সমবয়স্কদের সহিত মিলিয়া কত শৈশব-ক্রীড়ায় দিন অতিবাহিত হইয়াছে। বড় দুইটী ঝাউগাছ নদীর তীরে রাস্তার দুই পার্শ্বে এখনও আকাশের দিকে চাহিয়া বাঁচিয়া আছে, একদিন এই গাছের তলায় বসিয়া তাহারা নদীর শোভা দেখিয়াছে—ঢেউর চঞ্চল গতি দেখিয়াছে, কালো বৈশাখের জমাট কালো মেঘের তুমুল গর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য রঙ্গিনী তরঙ্গিনীর লহর-লীলা দেখিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়াছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুর বেলা দমকা হাওয়া যখন আমের শাখায় দোলা দিয়া রাশি রাশি কচি আম ফেলিয়া দিয়া যাইত, তখন পাড়ার ছেলে মেয়েদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া আম কুড়ানো কতই না আনন্দের ছিল! ধীরে ধীরে ষ্টীমার তীর সংলগ্ন হইলে সকলে জয়ধ্বনি করিয়া প্রভাতকে ষ্টীমার হইতে নামাইয়া লইল—সে এইরূপ অভ্যর্থনার কোন আশা করে নাই। দেশের লোকের এইরূপ অকৃত্রিম প্রীতি ও আদরে তাহার হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া গেল। প্রভাত তীরে উপনীত হইয়া গ্রামের যে সকল পূজনীয় বৃদ্ধগণকে দেখিতে পাইল তাহাদিগের পদধূলি মাথায় লইল, তাহার এই ভক্তি ও সৌজন্যের ভাব দেখিয়া তাঁহারা দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। যে দেশের লোকের প্রাণ কুসুমের চেয়েও বেশী কোমল, যাহারা শুধু দু'টো মিষ্টি কথায় সমুদয় রাগ বিরাগ ভুলিয়া যাইতে পারে, সেদেশে সামাজিক অশান্তি ও কলহ যে কেন জাগিয়া উঠে তাহা বলা যায় না। প্রভাত উপস্থিত সকলের সহিত অতি মিষ্টভাবে নানা কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল। গোপাল সান্যাল জাহাজ ঘাটে তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে গিয়াছিল বলিয়া মহিমবাবু আর অভিমান করিয়া সেখানে যান

নাই। তিনি বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন। কৌশলি ও এই পরিবারের হিতৈষী গোপালবাবু সকলের সহিত পরিচিত করিয়া দেওয়া এবং পারিবারিক অবস্থার নানা অশান্তি ও অব্যবস্থার কাহিনী অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বলিতে ছাড়ে নাই। এই প্রথম দিন দেশে পদার্পণ করিয়া প্রভাতের মনে দেশ জননীর প্রতি এক অপূর্ব প্রীতি ও অনুরাগ বিকশিত হইয়া উঠিল। মহিমবাবুর সহিত পরিচয়ের পর প্রভাত তাহাকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া কহিল—"আপনি আমাদের পরিবারের হিতৈষী বন্ধু বহুদিন যাবত এ সংসার পরিচালনা করে আসছেন, বাবা আমাকে আপনার কাছে কয়েকদিন থেকে কাজকর্ম শিখবার জন্ম পাঠিয়ে দিয়েছেন, একটু শিখিয়ে পাড়িয়ে নেবেন।"

মহিমবাবুর মুখের উপর দিয়া আত্ম প্রসাদের একটা গৌরব-দ্যুতি খেলিয়া গেল। তিনি মৃদুস্বরে কহিলেন,—"সেকি কথা. কুমার বাহাদুর, আপনার বাবার আমলেই আমার এসেছি, আমরা এখন বৃদ্ধ হয়েছি, আর কদিনই বা বাঁচবো আপনার মত বিদ্বান ও বুদ্ধিমান্ লোক যদি সব দেখে শুনে নেন তাহলেই যে আমার সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচি।"

প্রভাত কহিল,—"আমরা কি আপনাদের মত যোগ্য হব?"

গোপাল সাণ্যাল পাশে দাঁড়াইয়াছিল, মহিমবাবু যখন কথা বলিতেছিলেন তখন তাহার মুখে একটা দুষ্ট ক্রূর হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। প্রভাত লক্ষ্য না করিলেও, মহিমবাবুর সতর্ক বক্রদৃষ্টি তাহা এড়াইয়া যায় নাই। তিনি বাহিরে প্রভাতের সহিত মৃদুকণ্ঠে কথা কহিতেছিলেন বটে কিন্তু অন্তর মধ্যে ক্রোধের একটা প্রবল দাবানল এমনি ভাবে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল যে যদি সেকালের মুনি, ঋষিদের মত ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলে সে মুহূর্ত্তেই সান্যালকে ভস্মস্তূপে পরিণত করিয়া ফেলিত।

চতুর মহিমবাবু এমনি ভাবে প্রভাতের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন যে তাহার মনের মধ্যে কোনরূপ অতৃপ্তি বা অশান্তি আছে তাহা কেহই বুঝিতে পারিতেছিল না।

এই ভাবে সেদিন মহিমবাবুর সহিত প্রভাতের পরিচয় হইয়া গেল। প্রভাত কি জানি কেন, বাহ্যিক শিষ্টাচারের সহিত মহিমবাবুর সহিত আলাপ করিলেও তাহাকে খুব প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারে নাই। মাথার উপর ভারি কাজের বোঝা লইয়া চুপ্ করিয়া বসিয়া থাকা চলে না, বাড়ীর সব কাজ দেখিয়া শুনিয়া তাহাকে শীঘ্রই আবার নূতন কার্য্যক্ষেত্রে সমুদয় শক্তি ও কর্ম্ম প্রবণতার সহিত অগ্রসর হইতে হইবে, কাজেই পরদিন প্রভাত মহিমবাবুকে ডাকাইয়া কহিল—"দেখুন, আপনি ষ্টেটের সমুদয় কাগজ পত্র প্রস্তুত করুন। কালই আমি সব দেখা সুরু করবো।"

গোপাল সম্মুখেই ছিল, সে হাসিয়া কহিল—"আজ্ঞে, এ অতি ঠিক্ কথা, মালিক যদি নিজে সম্পত্তি নিজের চক্ষে দেখে শুনে নেন, তাহলে তার চেয়ে আর কি আনন্দ হতে পারে! যার কাজ করা, তিনি যদি নিজে দেখেন, তাহলে কাজ করে সুখ আছে, কুমার বাহাদুর, যারা নিজের সম্পত্তির কোন খোঁজ খবর রাখেন না—দূরে সরে পড়ে থাকেন, আর শুধু হাতখরচার টাকাটা পেলেই খুসী হন, তাদের কথা আলাদা।"

প্রভাত প্রথম দৃষ্টিতেই গোপাল সান্যালকে কি জানি কেন সুনজরে দেখিয়াছিল, তাহার বাচালতা—তাহার স্পষ্টবাদিতা ও বহুভাষিতা কোনরূপ বিরক্তির উদ্রেক না করিয়া বরং তাহাকে আনন্দ দিতেছিল। কোন মানুষের পক্ষেই, সকল সময়ে একভাবে সময় কাটান চলে না, তা তিনি যত বড় রাসভারি ব্যক্তিই হউন না কেন। গ্রামে আসিয়া প্রথম

হইতেই গোপাল সান্যালের সহিত পরিচিত হওয়ায় প্রভাতের সত্য সত্যই তাহাকে ভাল লাগিয়াছিল। তাহার কথার ভিতর যে বক্র প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ছিল, ষ্টেটের অনেক গোপন রহস্যই তাহাতে ব্যক্ত হইতেছিল, মহিমবাবু তাহা বুঝিতে পারিয়া একটা ক্রোধপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন—"দেখুন গোপালবাবু, সব সময়ে রহস্য করা শ্রেয় নয়, এ সব কাজের কথা। কুমার বাহাদুর নিজে দেশে এসেছেন, এর চেয়ে আমাদের আর কি আনন্দ হতে পারে? তারপর তিনি শুধু আমাদের এ অঞ্চলের নয়, ভারতবর্ষের গৌরব।"

প্রভাত কহিল—"সে কিছু নয় মহিমবাবু, গোপালবাবুকে আমার বেশ ভাল লোক বলেই বোধ হচ্ছে, ওঁকে পেয়ে আমি কোন অসুবিধা বোধ কচ্চি না, বিশেষ ইনি সব খবরই রাখেন। দেশের রাজনৈতিক সংবাদ হ'তে পলো খেলা ও ফুটবল খেলার খবরও ওঁর অজানা নেই।"

মহিমবাবু আর কোন কথা কহিলেন না। প্রভাত পুনর্বার কহিল—"আমি সেরেস্তার সমুদায় কাগজ পত্র, তাওলাত বরাতের হিসাব, ষ্টেটের ঋণের জায় দেখতে চাই। আপনি সব কাগজ পত্র ঠিক করুন। কালই আমি সব চাই।"

মহিমবাবু মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে কহিলেন—"কুমার বাহাদুর! আপনি ছেলে মানুষ। জমিদারি সেরেস্তার কাজ বড় জটিল কাজ, ওসব ত' একদিনের মধ্যে দেখাশুনা শেষ করা চলে না। আর যে রকমের গোলমেলে সেরেস্তা গুছিয়ে গাছিয়ে নিতেও ঢের সময়ের দরকার। এ যাত্রায় যে আপনাকে দেখিয়ে শুনিয়ে দিতে পারবো, সেত আমার মনে হয় না।"

প্রভাত কহিল—"এ আপনি কি রকম আপত্তি তুলছেন, আপনাকে ত ঢের দিন আগেই খবর দেওয়া হইয়াছিল। তারপর আপনি আজ পনের কুড়ি বৎসরেরও উপর এ ষ্টেটের কাজ করে আসছেন, আপনার একার

তত্ত্বাবধানেই সব হয়েছে, এমন অবস্থায় কাগজপত্র বিশৃঙ্খল কি করে যে হল, সেত আমি কোন মতেই বুঝে উঠ্‌তে পাচ্ছিনা। আমি ওসব বুঝিনা, এ যাত্রা ষ্টেটের একটা সুব্যবস্থা করবার জন্য এসেছি, আমি শিখ্‌তে এসেছি, এ সময়ে যদি আপনারা কোন আপত্তি তোলেন আপনাদের সে আপত্তিই আমি কোনমতেই শুন্‌বো না।"

এমনি দৃঢ়তার সহিত সে এ কথাকয়টি কহিল যে মহিমবাবুর মুখ একেবারে ছাইয়ের মত সাদা হইয়া গেল। গোপাল সান্যাল হাসিয়া কহিল—"ঠিক কথাইত কুমার বাহাদুর বলেছেন ম্যানেজারবাবু! এতদিন কেউ নিকাশ দেখেননি এবার দেখিয়ে ফেলুন, গোল চুকে যাক্।"

মহিমবাবু দাঁড়াইয়া কহিলেন—"বলি, সান্যাল মশাই, আপনার হাতের কাজ কতদূর এগিয়েছে?"

"আজ্ঞে—সে ঢের দিন শেষ হয়েছে; আর আমি ত আট টাকা মাইনের মুহুরী, নিকাশের দায়ী নই।"

মহিমবাবু ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন—তাহার চক্ষু হইতে অগ্নিকণা ফুটিয়া বাহির হইতেছিল, ক্রোধে সারা দেহ কাঁপিতেছিল, কিন্তু তিনি আর কোনও কথা না কহিয়া ধীরে ধীরে সেরেস্তার দিকে চলিয়া গেলেন। দীর্ঘকাল কার্য্য করিয়া এ সংযম তাহার হইয়াছিল।

প্রভাত কহিল—"গোপালবাবু, ম্যানেজারবাবু কেন যে এমন করে আপত্তি তুল্‌ছেন বুঝ্‌তে পাচ্ছিনা। বাবা কি একেবারে চোখ তুলে চাইতেন না?"

গোপাল করুণ কণ্ঠে কহিল—"তাহলে কি আর সোণার সংসার ছারখার হয়। ঋণে সব নীলাম হবার উপক্রম হয়ে উঠে! জানিনা তাঁকে এরা কোন্ মোহ-মন্ত্রে মুগ্ধ করে রেখেছিলেন। তিনি ত শুধু সই

করেই খালাস ছিলেন। কখনও কি দেশে আস্‌তেন? যখন দেশে ছিলেন, তখনও ঘুমুচ্ছিলেন, কখনও জাগেননি।"

প্রভাত মৃদুস্বরে কহিল—"বটে!"

গোপাল সাস্থাল কহিল—"মনিবের নুন খেয়েছি, এবার যতটা পারি সে নুনের গুণ গাইব। আমি আপনাকে যতটা পারি সাহায্য করবো। আমি কোন ভয় করিনে।"

প্রভাত করুণ কণ্ঠে কহিল—"পৃথিবীর সব দেশে সব কাজ বিশ্বাসের উপর চলে আস্‌ছে। বাবা নিজে না দেখে থাকেন, আপনারা দশজনও ত ছিলেন! সব কাজ একজনকে দেখেশুনে কর্‌তে হবে, এ কোন কাজের কথা নয়। এই যে মুষ্টিমেয় ইংরেজ ত্রিশকোটি লোকের বাসভূমি ভারতকে শাসন কচ্চেন, একি বিশ্বাসের উপর নয়? গভর্মেণ্টের কাজত আমরাই করে দিচ্চি। কই, সে সময় ত কেউ কোন অবিশ্বাসের কাজ করে সেরে যেতে পারেন না, আর যখন আপনাদের নিজেদের দেশের ও সমাজের একজন জমিদার, আপনার আত্মীয় স্বজন ও দেশবাসী লোককে কর্ম্মচারী নিযুক্ত করে কার্য্যভার পরিচালনের অনুমতি দেন, তখনই নানা অশান্তির কারণ ঘটে কেন? তখনই এত প্রবঞ্চনা হয় কেন? এই যে হীনতা, একজনকে সর্ব্বনাশ করে—অগাধ জলে ডুবিয়ে ফেলে অপরের ভাস্‌বার চেষ্টা এ আমি কোন মতেই সমর্থন কর্‌তে পারি না।"

গোপাল সান্ন্যল কহিল—"সে দোষ আমাদের আছে বলেই ত এই অধঃপতন, কিন্তু একথাটাও মনে রাখ্‌বেন কুমার বাহাদুর! যিনি নিজের বিষয় ভাল করে দেখ্‌বার ক্লেশটুকুও সহ্য কর্‌তে নারাজ, তাঁর কোনদিন ভাল হয় না। শত বিশ্বাসী কর্ম্মচারীও নিদ্রিত মনিবের সম্পত্তি রক্ষা কর্‌তে পারে না। ইংরাজ বড়, কেন না, তাঁর কাজ

কল্পনার শক্তি আছে, সব দিকে তার দৃষ্টি আছে, তারা আমাদের মত ভাব-প্রবণ নয়, আমরা মুখে যত বলি, কাজে তত করি না। মুখের চেয়ে আমাদের কাজ যদি বেশী হ'ত তাহলে আমাদের অনেক বেশী মঙ্গল হ'ত।"

প্রভাত এই গ্রামবাসী অর্দ্ধ শিক্ষিত ব্যক্তির কথাগুলির মধ্যে অনেক খানি খাঁটি সত্য কথা শুনিল।

১৮

সে রাত্রিতে হরিদাসীর বাড়ীতে মহিমবাবু ও কুমুদিনীর মন্ত্রণা-বৈঠক বসিল। আজ তিন চারদিন যাবত একটা মোকদ্দমার সাক্ষ্য দিতে কুমুদিনী জেলায় গিয়াছিল, কাজেই এদিকের কোন সংবাদ সে রাখত না।

মহিমবাবু তাহার অনুপস্থিতির দরুণ একটা অস্বস্তি অনুভব করিতেছিলেন, তাহার পক্ষ হইয়া নির্ভীক ভাবে কথা বলে সে কুমুদিনী ছাড়া অন্য কেহই ছিল না; এখন কুমুদিনীকে পাইয়া তাহার সাহস পূর্ণ মাত্রায় বাড়িয়া গেল।

রাত্রি প্রায় এক প্রহর হইয়াছে। পল্লী গ্রাম সুপ্ত। আকাশের এক কোনে কালো মেঘ জড় হইয়াছে। হাওয়া একটু জোরে বহিতেছে। বাঁশ বনে ফিস্ ফিস্ খস্ খস্ শব্দ হইতেছে। মাঝে মাঝে দুই একটা প্রভুভক্ত কুকুর চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। হরিদাসীর বাড়ী গ্রামের এক পাশে নদীর খানিকটা দূরে একটা ছোট খালের পারে অবস্থিত। দুপুর বেলা জেলা হইতে কুমুদিনী ফিরিয়া আসা মাত্র মহিম বাবু আনুপূর্ব্বিক অবস্থাটা বলিয়াছিলেন। কুমুদিনী সহর হইতে দিব্য তৈরী হইয়া আসিয়াছিল, সে সব কথা কতক জ্ঞানে বা কতক অজ্ঞানে শুনিয়া কহিল—"হুজুর! কোন চিন্তা করবেন না। রাত্রিতে আমার ওখানে

বসে পরামর্শ ঠিক্ করে, সব ব্যবস্থা স্থির করে ফেল্‌বো।" মহিম বাবু শিহরিয়া উঠিলেন—তিনি কহিলেন—"তোমার ওখানে? সেকি কুমুদিনী? কেউ যদি জান্‌তে পারে, ভারি একটা বদ্‌নাম বেরুবে।"

"কোন ভয় করবেন না, কোন জানাজানি হবে না, নইলে আপনার এখানে আস্‌তে পারি, কিন্তু না না সে যে হট্টগোল,—বিশেষ কুমার বাহাদুরও ত পাশা পাশি কোথাও থাক্‌বেন। সে হয় না হুজুর! আপনিই কথাটা ভাল করে ভেবে দেখুন না।" কথাটা যে সত্য তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রভাতের সর্ব্ববিধ সুব্যবস্থা করিয়া, দেখিয়া শুনিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসাও যে নেহাৎ সহজ নহে। অথচ, কাল হইতে কাগজ পত্র দেখা শুনা আরম্ভ হইবে। সময় নাই, এত দিন কুমুদিনী তাঁহাকে কেবলি ভরসা দিয়া আসিয়াছে যে আপনি কোন চিন্তা করবেন না, সব ঠিক করে ফেলবো, কিন্তু কার্য্যত সে কিছুই করে নাই। ম্যানেজার বাবু কার্য্যতঃ ষ্টেটের যে সমুদয় হুকুম, ইত্যাদি দিয়াছেন, সবই কুমুদিনীর পরামর্শানুসারে—সে সকল জাল জুয়াচ্চুরী ছল প্রবঞ্চনার ফলে যে কি হইবে, সে দিকে লক্ষ্য রাখেন নাই। রাজা ধরনীধর টাকা চাহিবা মাত্র পাইলেই সন্তুষ্ট থাকিতেন, কাজেই তিনি ইদানীং দেশে বড় একটা আসিতেন না, আসিলেও এসব দিকে কোনরূপ লক্ষ্য রাখিতেন না। নানাদিক্ বিবেচনা করিয়া অগত্যা মহিম বাবু কুমুদিনীর ওখানে যাওয়াই স্থির করিলেন। কুমুদিনী কহিল—"আজ শরীরটা বড় খারাপ, বিকেল বেলা কাছারীতে আস্‌বো না। আপনি হুজুর রাত্রি একটু বেশী হলে ওখানে যেতে ভুলবেন না, কোন ভয় করবেন না, হুজুর, আমি আপনার গোলাম হাজির হয়েছি।"

রাত্রি এক প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে। প্রভাত আহারাদির পর ঘুমাই-য়াছে। এই সময়ে মহিম বাবু ধীরে ধীরে হরিদাসী বৈষ্টবীর বাড়ীর

দিকে অগ্রসর হইলেন। কুমুদিনী সন্ধ্যার পর হইতেই মদ ঢালিতেছিল। তাহার উচ্ছৃঙ্খল আমোদে ও চীৎকারে হরিদাসী অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেও মুখে বা ব্যবহারে কুমুদিনীর প্রতি কোনও দুর্ব্যবহার করিতেছিল না। সে এত বড় কৃতঘ্ন বা মূর্খ ছিল না যে কুমুদিনীর প্রতি কোনরূপ অসদ্ব্যবহার করিয়া নিজের ভবিষ্যত স্বার্থ বিনষ্ট করিয়া ফেলে। হরিদাসী তামাক সাজিতেছে, কুমুদিনী টপ্পায় তান ধরিয়াছে, এরূপ সময়ে হরিদাসীর দোর গোড়ায় শব্দ হইল। কুমুদিনীর সব কথাই জানা ছিল, সে শব্দ শুনিবা মাত্র গাঢ় নিদ্রার ভান করিয়া পড়িয়া রহিল। হরিদাসী চাপা গলায় কহিল—"কে গা তুমি?"

বাহির হইতে উত্তর আসিল "আমি। দোরটা খোল না?"

হরিদাসী গর্জ্জিয়া কহিল—"বাপ, নামটা বল না, নাম না বল্লে দোর খুলবো না।" এইবার উত্তর আসিল—"কুমুদিনী কি বাড়ী নেই?"

"নেই ত, কোন চুলোর গোড়ায় যাবে? কেন, তাকে কেন?"

"বল তাকে একটু ডেকে দাও, একটু দরকার আছে। কুমুদিনী তখন নাসিকা গর্জ্জন আরম্ভ করিয়াছিল। এই গর্জ্জনটা যে কোন্ অবস্থায় হইতেছিল তাহা ভাল করিয়া বোঝা যাইতেছিল না। কয়েক মিনিট পূর্ব্বেও যাহার টপ্পার বিকট চীৎকারে পল্লীখানি মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল, সহসা তাহার এইরূপ নীরবতা যে খুব বিস্ময়ের বিষয় তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। হরিদাসী কুমুদিনীর গা ঠেলিয়া কহিল—"ও মুখপোড়া, খুব যে ঘুমুচ্ছিস্, একবার উঠে দেখ না বাইরে আবার কোন্ পোড়ার মুখো এসে তোকে ডাকাডাকি করচে।" আবার বাহির হইতে মিনতির স্বরে অনুরোধ আসিল—"কুমুদিনী, ও কুমুদিনী, দরজাটা খুলে দাও। বাইরে ভিজ্‌ছি।" এ সময়ে কোণের কালো মেঘটা জমাট বাঁধিয়া বৃহদাকার ধারণ করিয়াছিল, তাহার বক্ষ হইতে ঝর্ ঝর্ করিয়া বৃষ্টি

হইতেছিল, দম্‌কা হাওয়াটা তখন থামিয়া গিয়াছিল। মাঝে মাঝে গুর্‌ গুর্‌ করিয়া মেঘ ডাকিতেছিল। মানুষের অবস্থার পরিবর্ত্তন কখন কি ভাবে হয় কেহই বলিতে পারে না। যে মহিম বাবুর প্রতাপে ধরণীবাবুর জমিদারীর সমগ্র প্রজা থরহরি কম্পমান হইত, যাহার কাছে আমরা কর্ম্মচারীরা সন্ত্রস্ত, আজ কি না সেই মহিম বাবু—তাহারি অধীনস্থ সামান্য একজন মুহুরীর কাছে কৃপাপ্রার্থী অবস্থায় বাহিরে দাঁড়াইয়া বৃষ্টির জলে ভিজিতেছেন! মহিমবাবুর সত্য সত্যই চোখে জল আসিয়াছিল—ক্ষণে ক্ষণে একটা অনুতাপের জ্বালা আসিয়া তাহার মনের ভিতর অশান্তির ঝড় প্রবলভাবে তুলিয়া দিয়াছিল। মানুষের অবস্থা কখন কি ভাবে পরিবর্ত্তিত হয়, সে কথা মানুষ বলিতে পারে না। হরিদাসীর ধাক্কা খাইয়া কুমুদিনী চমকিত হইয়া চীৎকার করিয়া কহিল—"বাইরে কে ডাকাডাকি কচ্চেন?"

মহিমবাবু কুমুদিনীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া উৎফুল্ল কণ্ঠে কহিলেন—"আমি এসেছি কুমুদিনী।" কুমুদিনী লাফাইয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি দরোজা খুলিয়া দিয়া কহিল—"আপনি কতক্ষণ এসেছেন হুজুর?" মহিমবাবু কহিলেন—"আধ ঘণ্টার উপর। বাইরে এসে ডাকাডাকি কচ্চি কারু সাড়া পাচ্ছিনে। তুমি কোথায় ছিলে?"

"আজ্ঞে, সেসব কথা পরে হবে, আগে আপনি ঘরে আসুন, উঃ তাইত, আপনার সারা গা যে ভিজে গেছে! কাপড়টা ছেড়ে ফেলুন—হুজুর!"

মহিমবাবু বিনা আপত্তিতে কুমুদিনীর কথানুযায়ী কার্য্য করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিবার পর কুমুদিনী কহিল—"আমি ভাব্‌তেও পারিনি যে, আপনি এত কষ্ট সয়ে এখানে আস্‌বেন। দয়া করে বরাবরই এ অনুগ্রহটুকু রাখ্‌বেন।"

হরিদাসী দরজার পাশে বসিয়া তামাক ভরিতেছিল—সে মাঝে মাঝে মহিমবাবুর দিকে কটাক্ষ করিতেছিল। মহিম বাবু স্বপ্নেও কোন দিন ভাবিতে পারেন নাই যে তাহার একদিন এইরূপ স্থলে আসিতে হইবে। হরিদাসী হুকোটা মহিমবাবুর হাতে দিয়া গলায় আঁচল জড়াইয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া কহিল "হুজুর। আমার এ কুঁড়ে আজ ধন্য হ'ল। দয়া করে পায়ের ধূলো দিয়ে ধন্য করলেন। তা কিছু ভাববেন না, সব মেঘ কেটে যাবে।" মহিমবাবু কুমুদিনীর দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিবা মাত্র সে হাসিয়া কহিল—"আজ্ঞে হরিদাসী সব জানে, ও আমার বুদ্ধির গলে।" একথা কহিয়া কুমুদিনী উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল।

মহিমবাবুর কাছে এ সমুদয় বাজে কথা আদৌ ভাল লাগিতেছিল না, নদীর স্রোতের মুখে যে পড়ে, সে যেমন সামান্য তৃণটিকেও অবলম্বন করিবার জন্য হাবুডুবু খাইয়া হাত বাড়ায়, মহিমবাবুর অবস্থাও আজ সেইরূপ; কুমুদিনী যদি আজ তাহার পক্ষ অবলম্বন না করে তাহা হইলে তিনি এ পর্য্যন্ত যে সকল অন্যায় করিয়াছেন সে ত্রুটি নিবারণের কোন পথই থাকে না। বাঙ্গলা দেশের জমিদারদের অধঃপতনের মূল কারণ তাহাদের কর্ম্মচারী নির্ব্বাচনে অমনোযোগীতা। তাহারা পূর্ব্বে অল্প বেতন দিয়া কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া সেই সকল দরিদ্র ভদ্রলোকগণের উদর পূর্ত্তির উদ্ধার স্বরূপ চুরি, জুয়াচুরি ও অত্যাচার শিক্ষা দিয়াছেন। আজ কাল শুধু শিক্ষিত কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইতেছেন, কিন্তু এ সকল কর্ম্মচারীর মধ্যে অধিকাংশ স্থলেই একটী প্রধান দোষ এই দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহারা কোনও ষ্টেটের উচ্চ কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইলে—সে সকল বড় বড় পরিবারের মধ্যে অনাবশ্যক কার্পণ্য, সংকীর্ণতা ও নীচতা আনিয়া দেন এবং সর্ব্বাপেক্ষা আত্মস্বার্থ সম্পূরণের জন্য অতিরিক্ত মাত্রায় মনোযোগী হইয়া উঠেন। রাজকোষে অর্থ সঞ্চয় করিয়া প্রভুর মনস্তুষ্টি করাই

ইহাদের একমাত্র লক্ষ্য হয়। শিক্ষা বিস্তার, পল্লী সংস্কার ও দানশীলতা এ সকল দিকে আর তখন ভূম্যধিকারীগণের কোনও মনোযোগ থাকে না। তাহারা শেষটায় এই শ্রেণীর কর্ম্মচারীগণের হাতের পুতুল হইয়া পড়েন। মহিমবাবুও এই শ্রেণীর কর্ম্মচারী হইলে বরং সম্পত্তি রক্ষা পাইত, কিন্তু তাহার কূটচক্রে সম্পত্তির অবস্থা যে কিরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহা পাঠক সম্প্রদায় জ্ঞাত আছেন।

কুমুদিনীর কথায় মহিমবাবু কহিলেন—"কুমুদিনী, কাল কুমার বাহাদুর হিসাব নিকাশ কাগজ পত্র সব দেখবেন ঠিক করেছেন। এখনও ত সব দিক্ গুছিয়ে আন্‌তে পারিনি, তুমি যা হয় ভেবে চিন্তে একটা মতলব ঠাওরাও।"

"আজ্ঞে, আমাকে কি নেমকহারাম মনে করেন?"

"সে কি রকম?"

"আজ্ঞে, এই যে মাস কাবার হলে মাইনে পাই, সে কার টাকা?"

মহিমবাবু শিহরিয়া উঠিলেন, তার মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল—তিনি মৃদুস্বরে কহিলেন—"আমিত তোমার কোন কথা ঠিক্ বুঝে উঠতে পাচ্ছি নে। এ কথার মানে কি?"

"মানে বুঝি না ম্যানেজার বাবু, আমরা ছোট আম্‌লা কর্ম্মচারী—আট দশ টাকা মাইনে পাই,. আমাদের পক্ষে চুরি চামারিটা সম্ভব পর, কিন্তু আপনি—যিনি মাসিক দু'শ টাকা মাইনে পাচ্ছেন, একটা ষ্টেটের সর্ব্বে সর্ব্বা, আপনার এমন মন কেন যে হ'ল তাই যে বুঝে উঠ্‌তে পাচ্ছি না। কাজটা কি ভাল করেছেন, ম্যানেজার বাবু? আগাগোড়া একবার আপনিই ভেবে দেখুন না;"

মহিমবাবু অবাক্ হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। দেয়ালের গায়ে মেটে প্রদীপের আলো পড়িয়া যে—আলো ও ছায়ার

সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার মাঝখানে যেন কত কি ভূত প্রেতের নৃত্য চলিতেছিল—হরিদাসা মিনি পুসীটাকে কোলে করিয়া ঘরে বিছান মাদুরের এক পাশে বসিয়া আদর করিতেছিল। কুমুদিনীর একপাশে মদের বোতল ও গ্লাস, তাহার দুই চক্ষু নেশায় ঢুলুঢুলু করিতেছিল—চুলগুলি রুক্ষ। মহিমবাবু বিস্মিত হইয়া কহিলেন—"এ কি কথা কুমুদিনী ?"

কুমুদিনী হাসিয়া কহিল—"ঠিক্ কথা।"

মহিমবাবুর সারা দেহ থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল—ক্রোধে তাহার দুই চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন—মাতাল হলে তোমার কাণ্ড-জ্ঞান থাকে না। তোমারই পরামর্শ নিয়ে আমি সব কাজ করেছি, আর আজ কিনা তুমিই উল্টা সুরে কথা কইছ।

কুমুদিনী মৃদুস্বরে হাসিয়া কহিল—"দেখুন! একথা কেউ বিশ্বাস করবে না যে আমার মত একজন নগণ্য ব্যক্তির কথায় আপনার মত শিক্ষিত লোক কাজ করেছেন। অনেক রাত্রি হয়েছে—এখন যুমুনগে।"

"তাহলে আমার উপায় কি হবে কুমুদিনী ? আমি যে নিরুপায়, এত আর দু'চার টাকার কথা নয়—কি দিয়ে কি করবো কিছুই যে ঠাহর পাচ্ছিনে। যাহয় একটা উপায় কর কুমুদিনী।"

"আমি কি উপায় করবো বলুন ? উপায় ভগবান। এমন রামের মত ন্যায়পরায়ন সরল স্বভাবাপন্ন মনিবকে যে ঠকাতে পারে তার অসাধ্য কোন কাজ নেই। যান্ আপনি!"

মহিমবাবু গর্জ্জিয়া উঠিলেন—"বিশ্বাস ঘাতক! না—না—কুমুদিনী তুমি আমার বাঁচাও, তোমাকে আমি সন্তুষ্ট করে দোব। যতটাকা চাও তাই দোব।" জেলা হইতে আসিয়াও যে কুমুদিনীর মন তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য উন্মুখ ছিল, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাহার এইরূপ

পরিবর্ত্তনের কি যে কারণ হইতে পারে মহিমবাবু তাহা সহজে বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। মানুষের কি এত সহজে মনের পরিবর্ত্তন সম্ভব! অথচ বিপদ এই যে কুমুদিনী যদি তাহার হাতছাড়া হয় তাহা হইলে কাল অনেক ছল চাতুরীই প্রকাশ পাইবে। কুমুদিনীও এইটুকুই চাহিয়াছিল। পূর্ব্বে এই চাল দিলে কাজ হইত না—কিন্তু এখন উহাতে লাভ হইবে মনে করিয়াই কুমুদিনী বিপন্ন মহিমবাবুকে হাতের মুঠির ভিতর পাইয়া এইরূপ কৌশল করিতেছিল। ধূর্ত্ত ও চতুর ব্যক্তির ইহাই প্রধান লক্ষণ। মাছ বড়শী ধরিলে যেমন তাহাকে লইয়া খেলা করা সহজ, তেমনি কুমুদিনীর পক্ষে মহিমবাবুর সহিত খেলা করা তেমনি সহজ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। মহিমবাবু কহিলেন—"কুমুদিনী! তুমি আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার তুল্য, এই যাত্রা তুমি আমাকে বাঁচাও!"

কুমুদিনী হাসিয়া কহিল—"এ সব জাল জুচ্চুরী কেন যে করেন আমরা তাই বুঝে উঠতে পারি না। আমি কি করবো বলুন।"

"তুমি কি করবে? তুমিই সব করবে। তুমিই আমায় রক্ষা করবে! এ যাত্রা যদি তুমি আমায় বাঁচিয়ে দিতে পার তাহলে আমি তোমাকে উপযুক্ত পুরস্কার দোব।"

হরিদাসী হাসিয়া কহিল—"ওঁকেত দেবেন, কিন্তু আমায় কি দেবেন তা ত বললেন না?"

মহিমবাবু হাসিয়া কহিলেন—"তোমায় আমি এক ছড়া হার গড়িয়ে দেব।"

হরিদাসী হাসিয়া কহিল—"শুধু এক ছড়া হারে চলবে না, ম্যানেজার বাবু, আমাকে হাজার টাকা নগদও দিতে হবে।"

মহিমবাবু কহিলেন—"আমি তোমার সব কথা রাখবো, হরি! তুমি কুমুদিনীকে বলে দাও।"

হরিদাসী কুমুদিনীকে সম্বোধন করিয়া কহিল "দেখ, এত বড় লোক, জীবনে কোন দিন কোন কষ্ট সহ্য করেন নি, আজ দায়ে পড়ে তোমার কাছে এসেছেন, ভদ্র লোকের একটা ব্যবস্থা করে দাও।" কুমুদিনী বিরক্তির সুরে কহিল—"তোমায় ত বাবু দিব্য বন্দোবস্ত করে দিলেন, কই আমার ত কিছুই করলেন না। আমার সঙ্গে একটা রফা সফা হউক, তার পর বোঝা যাবে।"

মহিমবাবু ও কুমুদিনী দুইজনের মধ্যে বহু তর্ক বিতর্কের পর স্থির হইল যে কুমুদিনী যদি মহিমবাবুকে হিসাব নিকাশের দায়িত্ব হইতে উদ্ধার করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে সে দশ হাজার টাকা পাইবে। এবং সেই রাত্রিতেই বায়না স্বরূপ কতক টাকা তাহাকে দিতে হইবে। অগত্যা মহিমবাবু তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। দুষ্ট লোকের সহিত মিত্রতা করিলে তাহারা যে সুযোগ পাইলে নিজ স্বার্থ সিদ্ধির পথ কোনরূপেই অবহেলা করে না, ইহাই তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

আশ্বাস পাইয়া মহিম বাবু চলিয়া গেলেন। পথে যাইতে যাইতে এই চিন্তাটাই তাহার মনে বিশেষ করিয়া জাগিতেছিল যে—"একটা সামান্য লোকের পরামর্শ শুনিয়া তিনি কেন এমন অন্যায় কাজগুলি করিয়া ফেলিলেন? ধরণীবাবু ত তাঁহার হাতে সমুদয় সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপেই সঁপিয়া দিয়াছিলেন। একদিনের জন্যও হাসিমুখ ছাড়া কথা কহেন নাই, অথচ তিনি কি করিয়াছেন? জমিদারীর কোনরূপ ব্যবস্থাই করেন নাই। গ্রামের তহশীলদারেরা খাজনার টাকা বিনা দাখিলায় প্রজাগণের নিকট হইতে অনেক টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে—তিনি তহশীলদারদের নিকট হইতে সামান্য কয়েকটী টাকা ঘুষ পাইয়াই তাহাদিগকে বিনা শাস্তিতে ছাড়িয়া দিয়াছেন। ধরণীবাবু নিজ হস্তে স্বাক্ষর করিয়া যে টাকা কর্জ্জ করিয়া ছিলেন তাহাও এদিকে তাহার নামে কত করিত

ধনপত ও রামহরি সাহার নামে যে হ্যাণ্ডনোট জাল হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সে সকল হ্যাণ্ডনোট জাল করিবার সহায় ও লেখক ছিল কুমুদিনী। এখন সে যদি বিদ্রোহী হইয়া উঠে তাহা হইলেত একেবারে নিরুপায়। নানারূপ দুশ্চিন্তায় ও দুর্ভাবনায় গ্রাম্য পিছিল পথ দিয়া মহিমবাবু অগ্রসর হইতেছিলেন—তাহার কোন দিকে লক্ষ্য ছিল না।

এই ভাবে যখন জমিদার বাড়ার সদর দরজার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন পাঁড়ে জী পাহারা দিতেছিলেন, হঠাৎ মহিম বাবুকে দেউড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া সে হাঁক দিয়া কহিল—"কোন হ্যায় ?"

মহিম বাবু ধীরে চাপা গলায় কহিলেন—"আমি পাঁড়ে জী।"

ফিন্—ম্যানেজার বাবু, সেলাম, এতনা রাতসে আপ্ কাহাসে আয়া ?

ম্যানেজার বাবু উত্তর করিলেন—"এই এখান থেকেই এলুম।"

পাঁড়েজী আর কোন কথা বলিল না। মহিমবাবুও বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেলেন।

তিনি চলিয়া গেলে পাঁড়ে জী হাসিয়া নিজ মনে কহিল—এায়সে বাত, ম্যানেজার বাবুভি হারদাদাকো আস্‌নাইমে মস্‌গুল হো গিয়া! হা! হা! হা! নেহি ত এতনা রাতমে কাঁহাসে আয়াঙ্গে!

১৯

এত নিষেধ, এত সতর্কতা সত্বেও প্রজারা শুনিতে পাইয়াছিল যে তাহাদের কুমার বাহাদুর দেশের দুঃখ দুর্দ্দশা ও তাহাদের শোচনীয় অবস্থা দেখিবার জন্য আসিয়াছেন। তাই সকলে 'রাজধানীর' দিকে অগ্রসর হইল। প্রজারা সচরাচর জমিদার বাড়ীকেই রাজধানী বলে।

কুমার বাহাদুর বড় বিদ্বান, বিলাত মুল্লুকে গিয়াছিলেন—এসব নানা যশের কথা মুখে মুখে প্রচারিত হওয়ায়—তাহারা জোট বাঁধিয়া দলে দলে পোটলা পুটুলি লইয়া জমিদার বাড়ীর দিকে চলিল।

বাঙ্গালা দেশের যে জমিদার সরল, শান্ত, নিরীহ প্রজার প্রতি অত্যাচার ও অবিচার করে তাহার মত পাপিষ্ঠ বুঝি আর নাই। এক বেলা মোটা ভাত খাইয়াও যাহারা মনিবের খাজনা যোগায়, মাঠত দেয়, পেয়াদা বরকন্দাজের লাথি গুঁতো খাইয়াও মনিবের গুণ গায়, বিপদের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ঈশ্বরের নামের সঙ্গে সঙ্গে মনিবের নাম লইয়া শান্তি পায়, সে দেশের জমিদার যদি প্রজার প্রতি অত্যাচারী ও অবিচারী হয় তাহা হইলে বিধাতার অভিশাপ যে আপনা হইতেই রুদ্ররূপে প্রকাশ পাইবে—সে নিশ্চিত। পরদিন ভোরের বেলা হাত মুখ ধুইয়া কাছারী ঘরের প্রাঙ্গণের সন্নিকটে আসিতেই প্রভাত দেখিতে পাইল যে দেউড়ী ঘরের সম্মুখের মাঠে হাজার হাজার লোক মিলিত হইয়াছে, তাহাদের প্রায় সকলের হাতেই লাঠি। গোপাল সান্যাল প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছিল, প্রভাত তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"সান্যাল মশাই, এত লোক কিসের—কোন দাঙ্গা হাঙ্গামা হয়েছে নাকি ?"

সান্যাল হাসিয়া কহিল—"কুমার বাহাদুর! আপনারা দেশের লোক হয়েও দেশকে চিন্‌লেন না, তাই বড় দুঃখ হয়; এরা সব আপনার প্রজা, শুনেছে আপনি বাড়ী এসেছেন, তাই দলে দলে রাজ-দর্শনে এসেছে। এরা রাজা বল্‌তে আপনাদেরই বোঝে, আপনাদের সুখ দুঃখেই তাদের সুখ দুঃখ।" "তাই নাকি ?" কেন জানি প্রভাতের দুই চক্ষুতে অশ্রুর বাণ ডাকিয়া গেল। সে উৎফুল্ল মনে কহিল—"এরা কি করে জান্‌লে যে আমি দেশে এসেছি ?"

"এরা জান্‌ত না, জান্‌বার উপায়ও ছিল না, কিন্তু আমরা কয়েকজন

আমলা কর্ম্মচারী গোপনে গোপনে এদের কাছে সংবাদ পাঠিয়েছিলুম। কর্ত্তা ত আজ আট দশ বৎসর প্রবাসী—ম্যানেজার বাবুই সর্ব্বে সর্ব্বা, আমি সামান্য কর্ম্মচারী—আপনাকে তাঁর বিরুদ্ধে কোন কথা বলা ভাল নয়, আজ আট দশ বৎসর যাবত—প্রজারা তাদের মনিবের মুখ দেখেনি, শুধু লাঠির গুঁতো, মিথ্যা খতের ও বাকী খাজানার নালিশের দায়ে ভিটা মাটি ছেড়ে—হাহাকার করে শুধু উপরে বিচারের প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কুমার বাহাদুর! আমরা আপনাদের অন্নে প্রতিপালিত, আমাদের এই মিনতি আপনি নিজ চক্ষে সব দেখে শুনে কাজ করবেন।"

প্রভাত কোন কথা কহিল না। প্রাঙ্গন মধ্যস্থ বকুল গাছটীর বাঁধান সানের উপর সে চুপ করিয়া বসিল। গ্রীষ্মের সুন্দর শান্ত মধুর প্রভাত। তরুণ রবি তখনও ভাল করিয়া যৌবন-গর্ব্বে গর্ব্বিত হইবার অধিকার লাভ করে নাই। রাশি রাশি বকুল ফুল গাছের তলে ঝরিয়া পড়িয়াছে, অসংখ্য ভ্রমর গুণ গুণ করিয়া গুঞ্জরিয়া ফিরিতেছে। দীঘির কালো জলে ছোট ছোট ঢেউ গুলি চঞ্চল ক্ষুদ্র শিশুর মত ছুটাছুটি দৌড়া-দৌড়ি করিতেছে। প্রভাতের কাছে আজ এই সুন্দর নবীন প্রভাত যে নবীন সুরের উন্মাদনা আনিয়া দিয়াছিল—তাহার ভিতর শুধু আশা ও উৎসাহের সঞ্জীবনীশক্তি স্ফুরিত হইতেছিল। এই দেশ—এই মাটি—এই গাছপালার ফুল ফল, এই আকাশ, খাল বিল এরা যত আমার আপনার, বাঙ্গালা দেশের আর কোন স্থানইত তত আপনার নয়। সে পলক মধ্যে দেখিতে পাইতেছিল জীর্ণ দুঃখ দীর্ণ পল্লীবাসীর কুটীর প্রাঙ্গণে কল্যাণময়ী দেশ-লক্ষ্মী ঝাপি হস্তে দাঁড়াইয়া শতকোটী সন্তানকে আহ্বান করিতেছেন—নগরের বিলাস-মোহ-মদিরা দূর করিয়া এখানে এস। কোন দিন কোন কালে জগতের ইতিহাসে এমন কথা লেখে না যে দরিদ্র কুটীরবাসীদিগকে উপেক্ষা করিয়া দেশ জাগিয়াছে, কোন দেশের ইতিহাসে

এমন কথা লেখে নাই যে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সম্বোদ্ধত ব্যক্তির বক্তৃতায় সহরে দেশ জাগিয়াছে। জাতি সে দিন জাগে—দেশ সে দিন জাগে যেদিন দেশ প্রীতির মিথ্যা অহঙ্কারী ঘৃণিত কুকুরের দলের বৃথা আস্ফালন, দেশের রাখাল, চাষী ও সাধারণের হুঙ্কারে ধূলিশাৎ হইয়া যাইবে।

প্রভাত প্রফুল্ল মনে—নবীন উদ্দীপনায় উদ্দীপিত হইয়া যেমন দেউড়ীর বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, অমনি সহস্র কণ্ঠে 'জয় কুমার বাহাদুরের জয়' চীৎকারে প্রজারা পল্লী মুখরিত করিল। তাহার পদধূলি লইবার জন্য ব্যাকুল আগ্রহে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। প্রভাত তাহাদিগকে বিনয় বাক্যে মান্য করিয়া কাছারী ঘরে যাইয়া বসবামাত্র আবার একটা গোল পড়িয়া গেল। কেহ কোনরূপ বাধা দিয়াও তাহাদিগকে নিরস্ত করিতে পারিল না—কেহ টাকা নজর দিল, কেহ গাছের ফল, কেহ নিজের তৈরী শিল্প দ্রব্য, কেহ গাইয়ের দুধ, কেহ মৎস্য যে যাহা পারিয়াছিল, যাহার যতটুকু সাধ্য, সে তাহা লইয়াই আসিয়াছে। প্রভাত সকলের সহিত মিষ্ট কথায় আপ্যায়ন করিয়া তাহাদের উপহৃত দ্রব্যাদি অতি সমাদরে গ্রহণ করায়, প্রজাদের মনে অপূর্ব্ব তৃপ্তির উদয় হইল। একজন আশী বছরের বৃদ্ধ মুসলমান যখন লাঠি ভর দিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে প্রভাতের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—'কোথায় আমাদের খোকাবাবু কোথায়?' প্রভাত আর বসিয়া থাকিতে পারিল না, সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বৃদ্ধকে বুকে টানিয়া লইল। অমনি সকলে আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল। বৃদ্ধ জীবনে কোন দিন এমন আনন্দ, এমন ভালবাসা পায় নাই, সে আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিল। দুই খানি শীর্ণ কম্পিত হস্ত প্রভাতের মাথায় বুলাইতে বুলাইতে অশ্রু সজল নয়নে কম্পিত কণ্ঠে কহিল—'বাবার অক্ষয় পরমাই হউক—রাজা হও।' আর তাহার মুখ হইতে কোন কথা বাহির হইল না।

প্রভাতের এই মধুর অমায়িক ব্যবহারে উপস্থিত সহস্র সহস্র প্রজার চিত্ত আপনা হইতেই তাহার দিকে ভক্তির প্রবল উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। এক নিমেষে সে প্রজার হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইল। এমন জয় লাভে যে আনন্দ—শত শত জার্ম্মেন যুদ্ধে জয়লাভ করিলেও বুঝি তাহা হয় না।

মহিমবাবু এক পাশে দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিতেছিলেন,—তাহার মনে হইতেছিল এক্ষুনি পাইক, বরকন্দাজদের ডাকাইয়া এ সকল হতভাগাদের তাড়াইয়া দেন। কিন্তু ভগবানের এমনি বিচার যে যখন কোনও ব্যক্তি-গত শক্তি অপ্রতিহত রূপে নিরীহ সাধারণ প্রজার উপর প্রবল হইয়া উঠে, অত্যাচারের ভীষণ লেলিহান জিহ্বা পিশাচের রক্ত পিপাসা নিবৃত্তির মত তাহাদিগকে পিষিয়া মারিতে চাহে, তখনই বন্যার জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় একটা নৈসর্গিক শক্তি আসিয়া তাহাদিগকে কর্ম্মের দিকে টানিয়া লইয়া যায়, তাহারা অত্যাচার অবিচারের নির্ম্মম কটাক্ষ উপেক্ষা করিয়া সাহসে বুক বাঁধিয়া দাঁড়ায়। আজ—ধরণীবাবুর প্রজাদের মধ্যে বিধাতা সেই সাহস জাগাইয়া দিয়াছিলেন—তাহারা তাহাদেরই কুমার বাহাদুরকে পাইয়া মনের ক্ষোভ মিটাইয়া সব কথা প্রকাশ করিবার জন্য দল বাঁধিয়া আসিয়াছিল! মহিম বাবু দুই একবার উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছিলেন—"তোমরা এখন গাঁয়ে ফিরে যাও।" তাহার এ কথা শুনিয়া—হাদিরবক্স মোড়ল কহিল—"কেন গাঁয়ে ফিরে যাব? কি? আপনার কথায়? কখনও নয়, আজ আমরা আমাদের মনিবকে পেয়েছি—সব কথা বল্‌বো, তিনি কি বলেন—সে কথা শুন্‌বো, তারপর যখন খুসী হবে—বাড়ী ফিরে যাব।"

হাদির বক্সের কথার প্রতিধ্বনি তুলিয়া সমুদয় উপস্থিত প্রজারা একসঙ্গে কহিয়া উঠিল—"কেন যাব? কিসের জন্য? আমাদের রাজার বেটাকে আজ আমরা খাই বা না খাই মনের সাধ ও চোখের সাধ মিটিয়ে

দেখে, তবে যাব।" প্রভাত সত্য সত্যই আজ অন্য মানুষ হইয়া গিয়াছিল। সে আকুল কণ্ঠে কহিল—"ভাই সব, তোমরা আমায় এত ভালবাস তাত কখনও মনে করিনি। তোমাদের সুখ দুঃখেই আমার সুখ দুঃখ। তোমরা জান—ষ্টেট ঋণগ্রস্ত, যতদিন না সে ঋণ শোধ করতে পারি—ততদিন তোমাদের আমি ইচ্ছামত কোন উপকার করতে পারবো না। তোমাদের সকলের আশীর্ব্বাদে যদি ষ্টেটের অবস্থা আবার ভাল হয়—তা হলে আমি বাবাকে বলে তোমাদের অভাব অভিযোগ শুনবো ও সাহায্য করতে চেষ্টা করবো। এখন তোমরা সকলে মিলে শুধু কথা বলে যদি অভাব অভিযোগের কথা বল, তা হলে গোলমাল হবে। তোমরা এক কাজ কর—তোমাদের ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের মোড়লেরা আমাকে লিখে জানাও তোমাদের কি অভাব কষ্ট আছে, তোমাদের উপর কোন অন্যায় অবিচার হয়েছে কি না, আমি প্রতিজ্ঞা করে বলছি—যে করেই হয়, তোমাদের সে অভাব ক্লেশ দূর করবো—আমার প্রাণ-পণ।" প্রভাতের মনের উপর কেমন একটা আবেগ কেমন একটা উত্তেজনা আসিয়াছিল—সে কোনরূপেই আপনাকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছিল না।

প্রজাদের মোড়ল হইয়া হাদির বক্স কহিল—"কুমার বাহাদুর! আপনি ঋণের কথা ভাববেন না, যদি দরকার হয় আমরা [illegible] করে টাকাটা তুলবো। আমরা সব আপনার ভাই থাকতে, ছেলে থাকতে ঋণের কি ভয়। এ ক'বৎসর আমরা নানা অত্যাচার অন্যায় বিচার সহ্য করে এসেছি—আমরা সব আপনাকে লিখে জানাচ্ছি। আপনি আবার কবে দেশে আসবেন? আমরা চাই আপনি দেশে থাকেন। প্রজার বাপ মা—জমিদার—তারা যদি দেশ ছেড়ে যান, তাহলে তাদের জন্য মায়া মমতা কার থাকবে হুজুর!" প্রভাত কহিল—"আমি তোমাদের মধ্যেই থাকবো—তোমাদের কাজই করবো। তোমরা এখন খাওয়া দাওয়া

ব্যবস্থা কর—আজ তোমরা আমার অতিথি আজ তোমাদের সঙ্গে মিলে মিশে আমি ডাল ভাত খাব।" প্রজাদের মন কি এমন মিষ্ট-মধুর কথায় না গলিয়া থাকিতে পারে? তাহারা ধীরে ধীরে নদীর দিকে চলিয়া গেল।

এইবার হিসাব নিকাশের পালা। কুমুদিনী কাছারীতে আসে নাই—সে রাত্রিতে ম্যানেজার বাবুর নিকট হইতে টাকা আদায় করিতে ভোলে নাই, অথচ তাহার খোঁজ নাই। পরাণ সিং বারবার খোঁজ করিতে যাইয়াও তাহার খোঁজ পাইল না—সে হরিদাসীর বাড়ীতে নাই। গোপাল সান্যালের সাহায্যে প্রভাত একে একে কাগজ পত্র—ঋণের দলিল ইত্যাদি সব খোঁজ করিতে যাইয়া হিসাব নিকাশ কিছুই পাইল না। যে সব দলিল ছিল সে সকল সংগ্রহ করিল। মহিমবাবুর নিজ নামে নানা হিসাবে বহু টাকা হাওলাত লেখা—তাহার কোনও জমাখরচ নাই। আদায় সব জমা হয় নাই। কেবল ঋণের খত পুঞ্জীভূত। জমি পত্তন হইয়াছে—জেরের কোন টাকা জমা নাই—জলা বন্দোবস্ত হইয়াছে—সে টাকার উল্লেখ কোন কাগজ পত্রে নাই। মফস্বলের তহশীলদারদের কোন হিসাব জমা নাই—প্রভাত যুবক হইলেও বিচক্ষণ, নিপুণ ও ধীর স্থির প্রকৃতির লোক, সে সব কাগজ পত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ দেখিয়া যাহা বুঝিবার বুঝিল—গোপালবাবুকে সমুদয় কাগজ পত্রের ফিরিস্তা করিয়া বুঝাইয়া দিবার জন্য ম্যানেজার বাবুর প্রতি আদেশ করিয়া সে অসন্তুষ্টচিত্তে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। বিশ্বাসের যে এইরূপ শোচনীয় পরিণাম হইতে পারে এরূপ বিশ্বাস সে কোনদিন করিত না, আজ সংসারে পদার্পণ করিয়া তাহার মন হইতে সে বিশ্বাস অপসারিত হইল।

সন্ধ্যার পর সমুদয় হিসাব পত্র হইতে সে যাহা বুঝিতে পারিল তাহাতে জানা গেল—ঋণের মোট সংখ্যা সুদে আসলে পাঁচ লক্ষের কিছু উপর। জমিদারী আয় হইতে এত টাকা পরিশোধ হওয়া একরূপ অসম্ভব। এখন

উপায় কি ? প্রভাত জিজ্ঞাসা করিল—"মহিমবাবু, আমি এসেছিলাম ষ্টেট সম্পর্কিত কাজকর্ম্ম আপনার কাছে শিখবার জন্যে, ভেবেছিলাম দু'একদিনের মধ্যেই এদিক্‌কার কাজ সেরে কল্‌কাতা ফিরে যেতে পারবো, এখন দেখ্‌লুম—আপনি বহুদর্শী বিজ্ঞ ব্যক্তি হয়েও যে কাজ করেছেন একজন সাধারণ কর্ম্মচারীকে বিশ্বাস করলেও সে এমন কাজ করত না। আপনি বলুন—কেন আদায় উশুল, কাগজ পত্র ঠিক্ নেই।"

মহিমবাবু কহিলেন "ম্যানেজারের কর্ত্তব্য কাগজ পত্র লেখা নয়, সে কাজ আম্‌লা কর্ম্মচারীর কর্ত্তব্য। সেজন্য তারা দায়ী।"

প্রভাত কোপ-কটাক্ষ করিয়া কহিল—"তবে আপনার কি কাজ ?"

"শুধু হুকুম দেওয়া, চারিদিক দেখা শোনা।"

"তা হলে আপনি সম্পূর্ণ দোষী—আপনি কোন কাজ দেখেন নি। আর এতগুলো টাকা ঋণ যে কি করে হল তাওত আমি বুঝে উঠ্‌তে পাচ্ছিনা, সে হিসাব যে দেখ্‌তেই পেলুম না। সে দোষ কার বল্‌তে পারেন ?"

"দোষ কার সেত বুঝতেই পেরেছেন। যে আম্‌লার উপর জমা সেরেস্তার ভার ছিল, সে পলাতক।"

প্রভাত কহিল—"আপনার দোষ গুণ, ন্যায় অন্যায়ের বিচার মীমাংসার ভার বাবা আপনার উপর দেন নি, আপনি বহুদিনের কর্ম্মচারী—আপনি আমার সঙ্গে কল্‌কাতা যাবার জন্য প্রস্তুত হউন। সেখানে বাবার কাছে আমি সব কথা প্রকাশ করবো, তিনি দেখে শুনে যা হয় করবেন। উপস্থিত গোপালবাবু এখানকার কাজকর্ম্ম চালাবেন।"

মহিমবাবু, কুমুদিনীর বিশ্বাসঘাতকতায় মুষড়িয়া গিয়াছিলেন, এখন আর তাঁহার যে কোন উপায় নাই, এ সময়ে যদি কলিকাতা না যান তাহা

হইলে যে সন্দেহ আরও গুরুতর হইয়া উঠিবে। নানাদিক্ চিন্তা করিয়া মহিমবাবু মাথা নীচু করিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন—"যে আজ্ঞে।"

"তবে এখনি গিয়ে প্রস্তুত হতে থাকুন। আমরা কাল প্রত্যুষে ফিরতে চাই।"

ধীরে ধীরে চিন্তাকুল মনে মহিমবাবু বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন। গোপালবাবু কহিলেন—"কুমার বাহাদুর! আমার ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তির উপর কেন এ বোঝা চাপালেন?"

"সে কথা ভাববেন না, গোপালবাবু, ঈশ্বর যখন যার কাঁধের উপর যে কাজ ফেলে দেন, সে কাজে তাঁকে যোগ্যতা দিয়ে থাকেন।"

গোপালবাবু কহিল—"মহাজনদের নামের লিষ্ট তৈরী করেছি, এর ভেতর অনেক কল্পিত নাম আছে—কর্ত্তার নাম জাল করে সে সব টাকা ঋণ করা হয়েছে। আমি কুমুদিনীকে হাত করে নৌকাযোগে কল্‌কাতা রওয়ানা করে দিয়েছি—তার কাছে অনেক খবর ও দলিল দস্তখত আছে। এদিকে আমি সব ঠিক্ করতে পারব, বেশী বিলম্ব হবে না। একটা কথা মনে রাখবেন কুমার বাহাদুর, নিজের কাজ নিজে না দেখলে, সে কাজে কোনদিন সাফল্য হয় না। মেঘ থাকবে না—মেঘ কেটে গেলে আবার দেশকে ভুলবেন না। আপনাকে উপদেশ দেওয়ার মত জ্ঞান বুদ্ধি আমার নেই—তবে একটা কথা এই যে, আমার বয়স হয়েছে—আমাদের পল্লীগ্রামের উন্নতি করতে না পারলে কখনও কোনদিন আমরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতির নামের সহিত একসঙ্গে উচ্চারিত হবার গৌরব লাভ করতে পারবো না।"

প্রভাত কহিল—"আমি দেশের উন্নতির জন্য যতদূর সাধ্য প্রাণপণ করবো।"

গোপালবাবু হাসিয়া কহিলেন—"তা হলেই দেশ ধন্য হবে।"

২০

কোল সেয়ারে সর্ব্বস্ব দিয়া পাওনাদারের তাগাদায় চন্দ্রকান্তবাবু ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ভোর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দোকান পশারি হইতে সকলে আসিয়াই খাতা বগলে তাহার দোরগোড়ায় হাজিরা দিতে আরম্ভ করিল। এতদিন যতগুলি কোম্পানীর সেয়ার কিনিয়াছিলেন, তাহাদের সকলের নিকট হইতেই পত্র আসিতেছিল—লাভ হওয়া দূরে থাকুক—বাজার মন্দার দরুণ—সেয়ারের সমুদয় কল্‌ও তাহারা পান নাই, বোধ হয় বিজিনেস্ তুলিয়া দিতে হইবে। কি নিরাশার ব্যর্থ জীবন—শুধু হাহাকার আর নাই—নাই—একথা শুনিয়া অনাহারে, অনিদ্রায় দুশ্চিন্তায়ই কি তাহার জীবন কাটাইতে হইবে। প্রভা, বিপদের কালো মেঘ যে চারিদিক হইতে বেশ ঘোরালো ভাবে ঘিরিয়া ধরিয়াছে তাহা দিব্য বুঝিতে পারিয়াছিল। প্রভাত—গিরিডি ছাড়িয়া এ পর্য্যন্ত চন্দ্রকান্তবাবু কিংবা তাহাকে একখানা পত্রও লিখে নাই। পুরুষের উদ্দাম আবেগময় প্রেমোচ্ছ্বাসের যে অনেক সময় এইরূপ পরিণাম ঘটে—বাস্তবিক জীবনে সে তাহা অনুভব না করিলেও কেতাবে কোরাণে সে সব কথা সে ঢের পড়িয়াছে। কাল এক পাওনাদার আসিয়া বৃদ্ধকে শুধু টাকার জন্য তাগিদ দিয়াই ছাড়ে নাই, নানা কুৎসিৎ ভাষায় অপমান করিয়া তবে বাড়ী হইতে ফিরিয়াছে। আর একজন ত নালিশ করিবার জন্য প্রস্তুত। চাউলের দোকানদার আর বাকীতে চাল দিতে রাজী নয়, মুদী তেল, নুন ধারে ছাড়িবে না, অতি কষ্টে দিন চলিতেছে। জীবন অপরাহ্নে বৃদ্ধের এই জ্বালা যন্ত্রণা আর সহ্য হইতেছিল না।

জীবনে মানুষের যত প্রকার ভুল হয়, তন্মধ্যে টাকা কড়ি সম্পর্কের ভুলটা সকলের চেয়ে বড় ভুল। সে ভুল যদি তরুণ বয়স হইতে আরম্ভ

হয় তাহা হইলে আর রক্ষা নাই। সারা জীবন দুঃখ-দৈন্য ও হুতাশের মধ্য দিয়াই অতিবাহিত হইবে। চন্দ্রকান্ত বাবু যৌবন কাল হইতেই এই ভুল করিয়া আসিয়াছেন, তাই আজ তার এই শোচনীয় দুর্দ্দশা। প্রভা পিতাকে না জানাইয়া শিক্ষয়ত্রীর চাকরীর জন্য দরখাস্ত দিয়াছে। এ অভাবের প্রবল পেষণের মধ্যেও বৃদ্ধ কোনরূপে তাহার সঙ্কল্পচ্যুত হয় নাই। ভোর হইতে দুপুর পর্য্যন্ত খাটুনি চলিতেছে। এখন বৃদ্ধের একমাত্র আশা ও উৎসাহ দাতা সর্ব্ববিষয়ে প্রধানতম মন্ত্রী যতীন চৌধুরী। যতীন্ এই বৃদ্ধকে কেবলি আশার কথা বলিত। বর্ষা আসিয়াছে—কয়েকদিন যাবত খুব বৃষ্টি পড়িতেছে—সেদিন বৃদ্ধ একাকী বসিয়া আছেন। এ কয়মাসের মধ্যে তাহার চেহারাটা একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বৃদ্ধ হইলেও যে সবলভাব ও উৎসাহ তাঁহার ছিল, এখন আর তাহা নাই। একখানা ইজি চেয়ারের উপর বসিয়া তিনি জীবনের দুঃখ-দৈন্যের কথা ভাবিতেছেন,—এই সময়ে যতীন্ আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। চন্দ্রকান্তবাবু এই বৃষ্টির মধ্যেও তাহাকে আসিতে দেখিয়া মনে মনে বিশেষ আনন্দিত হইয়া কহিলেন—"যতীন্ যে এই ঝড় বাদলের ভিতর তুমি হঠাৎ কোথা থেকে এলে ?"

"আজ্ঞে—আজ ভোরেই কল্‌কাতা থেকে ফিরেছি। আপনি ভালত ?"

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া চন্দ্রকান্তবাবু কহিলেন—"আর ভাল বাবা ! এখন গেলেই বাঁচি !"

যতীন্ দুঃখিত হইয়া কহিল—"একি কথা বল্‌ছেন ? কিছু কি দুর্ঘটনা ঘটেছে !"

তখন চন্দ্রকান্তবাবু কোন কথা গোপন করার আবশ্যক মনে করিলেন না। যাহা ঘটিয়াছিল ও যাহা ঘটিতে চলিয়াছে, একে একে সে সব কথা

বলিলেন। তারপর অতি করুণ কণ্ঠে কহিলেন—"এখন কি করবো বল, আমার শেষ সম্বল যা কিছু ছিল তাওত তোমাদের কোল সেয়ারে দিয়েছি, এখন দেনার জ্বালা, তার উপর এই মেয়ে দুটীকে নিয়ে অনাহারে মরবার অবস্থা হয়েছে। কি করব বল?"

যতীন কহিল—"আপনার ঋণের পরিমান কত? কত টাকা হলে আপনি এখন এ সমূহ বিপদের হাত থেকে রেহায় পেতে পারেন?'

'দশ হাজার টাকার কমে কিছুতেই নয়। কিন্তু কে আমায়, কোন্ বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে এতটা টাকা ছেড়ে দেবে?'

"আমি দেব—চন্দ্রকান্তবাবু। আপনার মত মানুষকে যে বিশ্বাস করতে পারে না, সে কোনরূপেই মনুষ্য পদবাচ্য নয়। এই নিন্—একথা বলিয়া সে মুহূর্ত্ত মধ্যে বুক পকেট হইতে হাজার টাকার দশখানা নোট চন্দ্রকান্তবাবুর হাতের কাছে ফেলিয়া দিল। চন্দ্রকান্ত বুঝিতে পারিলেন না, এ সত্য কি মিথ্যা। তিনি আনন্দে গদগদ কণ্ঠে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন—"বাবা! তুমি মানুষ না দেবতা?"

যতীন সরলভাবে হাসিয়া কহিল,—"আমি অতি সাধারণ মানুষ, স্বার্থপর, আমি ত এমন কিছুই কার নাই, যার জন্য আপনি আমায় এতটা ধন্যবাদ দিতে পারেন। বিপদে বন্ধুজনকে সাহায্য করাইত মানুষের কাজ। আজ আপনার যে বিপদ উপস্থিত, একদিন আমারও ত অমন বিপদ হতে পারে। কিছু মনে করবেন না আপনি—আপনি ঋণের হাত থেকে উদ্ধার পান। ঈশ্বর যদি অনুগ্রহ করেন, এক কোল কোম্পানীর সেয়ারের ডিভিডেণ্ডের টাকা হতেও আপনার সব ঋণ শোধ হয়ে যেতে পারে।"

বৃদ্ধ বাস্তবিকই মুগ্ধ হইয়াছিলেন—এই যতীন যাহার বিরুদ্ধে তিনি এতদিন শত সহস্র কথা শুনিয়া আসিয়াছেন, দুশ্চরিত্র বলিয়া লোকে

যাহাকে ঘৃণা করে—আজ কিনা সেই ঘৃণিত ব্যক্তিই অপূর্ব্ব মহৎ ব্যবহারে তাহাকে বিস্মিত ও পুলোকিত করিয়া দিল। বিপদের প্রবল তরঙ্গের ভীষণ আক্রমণ হইতে তাকে এমন করিয়া রক্ষা করিবার জন্যত কেহ এতদিন অগ্রসর হয় নাই। চন্দ্রকান্তবাবু কাঁদিয়া ফেলিলেন—তাহার মুখ হইতে একটী কথাও আর বাহির হইতেছিল না। যতীন তাঁহাকে নীরব থাকিতে দেখিয়া কহিল—"আমি তা হলে এখন যাই। এ বৃষ্টি আর ধরছে না। ঢের কাজ আছে। জানেন ত আমি কল্পনার চেয়ে কাজ ঢের ভালবাসি! আজ, কাল এ দু'দিনের ভেতর এ দিক্‌কার সব কাজ সেরে পরশুদিন আবার কলকাতা চলে যাব। আপনি কিছু ভাব্‌বেন না। কোল সেয়ারের টাকাটা পেলেন বলে, সেয়ারও ত নেহাৎ কম নয়। ডিভিডেণ্ডের টাকাও ঢের হবে! এ ক'টা টাকার জন্যে আপনি কোন চিন্তা কর্‌বেন না, যখন সুবিধা হয় দেবেন।' একথা কয়টী এক নিঃশ্বাসে শেষ করিয়া উঠিতেই চন্দ্রকান্তবাবু দাঁড়াইয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিলেন—তারপর অশ্রু সজল নয়নে গদ্ গদ্‌স্বরে কহিলেন "বাবা! যদি কোন দিন কোন বিষয়ে আমি তোমার কোন উপকারে আসি আমায় বল্‌তে কোন দ্বিধা, কোন সঙ্কোচ কর না। নতুবা শুধু টাকা শোধ করে দিলেই তোমার এ ঋণ শোধ হবে না। এ ঋণ এ দান আমি বিধাতার আশীর্ব্বাদ বলে মনে করবো।"

যতীন তাঁহার পদধুলি মাথায় তুলিয়া লইয়া—মৃদুস্বরে বলিল—"একদিন আপনার কাছে আমিও একটী প্রার্থনা জানাবো, কিন্তু সেকথা আজ নয়, সময় হলেই বল্‌বো। আপনি দেনা পাওনা পরিশোধের ব্যবস্থা করুন, টাকাটা আমি পাঠাইয়া দিই।" আর কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া যতীন দ্রুত বাহিরে চলিয়া গেল। রাস্তায় মোটর দাঁড়াইয়াছিল কলের একটা ঝাঁকুনি—হর্ণের শব্দে চন্দ্রকান্ত বাবু বুঝিলেন সে চলিয়া গেল।

যতীন চলিয়া যাইবার অব্যবহিত পরেই প্রভা সেখানে উপস্থিত হইয়া কহিল—"বাবা! বেলা প্রায় শেষ হয়ে গেল, কথন উঠবে—কথন খাওয়া দাওয়া করবে?"

চন্দ্রকান্তবাবু মৃদুস্বরে কহিলেন "মা! সংসারে মানুষ চেনা বড় বিষম কথা, এই দেখনা, যতীনকে কোনদিনই আমরা শ্রদ্ধার চক্ষে দেখ্তে পারিনি। কিন্তু আজ যতীন্ যে ব্যবহার করে গেল তা কয়জনে কর্‌তে পারে, সে বিষয়ে সন্দেহ কর্‌বার যথেষ্ঠ কারণ আছে।" এই ভূমিকার পর চন্দ্রকান্তবাবু সমুদয় ঘটনা বিবৃত করিয়া কহিলেন "মা, কে পাপী, কে পুণ্যাত্মা, কে ভাল, কে মন্দ, এ বিচার মানুষ মানুষের কর্‌তে পারে না। যতীন্ আমাকে যে অপমানের দুর্বিসহ আঘাত ও জ্বালার হাত থেকে আজ রক্ষা করেছে, তার সেই মহদুপকারের কৃতজ্ঞতা আমি এ জীবনে ভুলতে পারবো না।"

প্রভা সব কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। যে যাহাকে শ্রদ্ধা বা ভালবাসার চক্ষে দেখিতে পারেনা, তাহার কাছে সেই ব্যক্তির প্রশংসার কথা কোনরূপেই আনন্দ দেয় না। প্রভা কোনদিন যতীনকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে নাই, কাজেই তাহার এই অর্থ সাহায্যের ভিতর কোনরূপ নিগূঢ় অভিসন্ধি আছে কিনা, সেইরূপ একটা কূটতর্ক তাহার মনের ভিতর আসিয়া উপস্থিত হইল। তবু সে যতীনের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিল না। হউক সে দোষী চরিত্রহীন—হউক সে সংকীর্ণ-চেতা স্বাথপর! কিন্তু সে এই পরিবারের বিপদের মুখে যে অপূর্ব্ব সহানুভূতি লইয়া আসিয়া দাঁড়াইল তাহা কি মহত্ত্বের পরিচায়ক নহে? প্রভাও পিতার সহিত সমস্বরে কহিল—"বাবা! যতীন্ বাবু বাস্তবিক দেবত্বের পরিচয় দিলেন।"

চন্দ্রকান্তবাবু এতক্ষণ কন্যার মুখের দিকে কৌতূহলপূর্ণ নেত্রে

চাহিয়াছিলেন—এইবার কন্যার নিকট হইতে সন্তোষজনক উত্তর পাইয়া পুলকিত হইয়া কহিলেন—"ঠিক্ বলেছিস্ মা, ঠিক্ বলেছিস্—বাস্তবিক সে আমায় রক্ষা করেছে। তুই খাবার কথা বল্‌ছিস্—উঃ আমি যে খাবার কথা ভুলে গেছলুম মা। ভোর থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত পাওনাদারের তাগাদা, অপমান, সে যে কত বড় ভীষণ সে আর তোকে বেশী কি বল্‌বো। এখন আমি সবল হয়েছি—দশজনের তাগাদার হাত থেকে মুক্তি পাবার পথ পেয়েছি। একটা কথা মা, যতীন্ যদি তোর প্রতি কোন অন্যায় করে থাকে, তুই সে কথা ভুলে গিয়ে তাকে ক্ষমা করিস্। তুই দেখ্‌বি যতীন্ একদিন ঘোর অপদার্থ, হীনচরিত্রের ব্যক্তি হলেও সময়ে সে মানুষের মত মানুষ হবে।"

প্রভা নতমুখে আঁচলটা সম্মুখের দিকে টানিয়া আনিয়া নাড়িতে নাড়িতে কহিল—"সে সব কথা এখন থাক্ বাবা, তুমি এখন খেতে চল, উঃ এ যে সন্ধ্যে হতে চল্‌লো।"

"কি ভাবে যে একটা দিন কেটে গেছে সে তোকে বল্‌তে পারবো না! এ ঋণ হলেও মা বিধাতার দান মনে করে আমি হাত পেতে নিয়েছি।"

"বাবা, আজ সুধীরের পত্র পেয়েছি।

"পেয়েছিস্ নাকি? সে কেমন আছে মা?"

'ভাল আছে, সে তার কাজের জন্য সুবেদার হয়েছে। কাপ্তেন সাহেব তাঁকে খুব ভালবাসেন। তার কোন দুঃখ, কোন ক্লেশ নেই, সে তোমাকে প্রণাম জানিয়েছে আগে!'

'সে আমি জানি। ও সব কাজে সুধীরকে কেউ হটাতে পারবে না। মা মরা ছেলে আমার সে যে কত স্নেহের তাত বুঝতেই পাচ্ছিস্। তুই কি চিঠির জবাব দিয়েছিস্! দেখ্‌দেখি কেমন ভুল, আমি ঋণের জ্বালায়

জর্জ্জরীভূত হয়ে তাকে একখানা চিঠি লিখবার পর্যান্ত সময় করতে পারিনি। দুঃখ কি জানিস্ মা সুধীর যদি লেখাপড়া শিখে মানুষ হত তা হলে কি তাকে আজ আরবদেশের মরুভূমে যেতে হত।"

"এখন সে সব কথা থাক্ বাবা। চল খেতে চল।"

"চল মা।"

২১

জেনারেল টাউনসেণ্ডের দল কুট-এল-আমরায় তুর্কীদের হাতে বন্দী হইয়াছেন—এই দলে সুধীরও বন্দী হইয়াছে। প্রথম অবস্থায় তুর্কীরা বন্দীদের প্রতি সদ্‌ব্যবহার করিবার অবসর করিতে পারে নাই, যুদ্ধে এমন ঘটনা প্রত্যহ ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। যে তুর্কী দলের উপর এই বন্দীগণের সর্ব্ববিধ ব্যবস্থা করিবার ভার ছিল, তাহারাও আজ কয়েক দিন হইল অন্যদিকে চলিয়া গিয়াছে। চারিদিকে অশান্তি—চারিদিকে দিবারাত্রি কামানের ভীষণ ধ্বনি। দুইদিন যাবৎ বন্দীদের অতি শোচনীয় অবস্থা, তুর্কীরা ভাল করিয়া ইহাদের খাদ্য যোগাইবার ব্যবস্থা করিতে পারিতেছে না, কে কাহার খাদ্য যোগাইবে? বন্দীগণ অনাহারে মৃতপ্রায় সামান্যতই এক টুকরা রুটি খাইয়াও এতগুলি বন্দীর ক্ষুধা নিবৃত্তি হইতে পারে না। যে সকল তুর্কী প্রহরী তাহাদের পাহারা দিতেছিল তাহারা সকলেই দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিল যে 'রসদ ফুরাইয়া গিয়াছে আমাদের কোন হাত নাই।' বন্দীগণ সকলে বিষণ্ণ—এরূপ সময়ে সুবেদার সুধীর কহিল—"কাপ্তেন সাহেব, যদি অনুমতি দেন, তাহলে আমি আজ আমাদের এই খাদ্য ক্লেশ দূর করতে পারি।

কাপ্তেন কহিল—'কিরূপে পার?'

সুধীর পশ্চিমদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া কহিল—"অই যে

ছোট পাহাড়টা আছে তার নীচে একটা বড় রকমের ফল ও সাক্-সবজীর বাগান আছে,—আমি দূরবীণ দিয়ে দেখলুম যদি সেখানে যেতে পারি তাহলে আমাদের আহারের কোনও অসুবিধা হবে না।"

কাপ্তেন বিস্মিত হইয়া কহিলেন—"অন্ধকার রাত্রি—দারুণ শীত, তারপর অনবরত গোলাগুলি চলিতেছে, এমন অবস্থায় তুমি কেমন করে সেখানে যাবে?"

সুধীর কহিল—"আমার একার প্রাণ দিয়েও যদি এতগুলি লোকের প্রাণ রক্ষা হয় তাহলে আমি আমার জীবন শ্লাঘা বলে মনে করবো। আর যদি নিরাপদে ফিরতে পারি তাহলে ত কথাই নাই।"

বন্দীর দল অবাক্ বিস্ময়ে সুধীরের দিকে চাহিয়া রহিল। সুধীর নির্ভীক—তাহার বদনমণ্ডলে এক অপূর্ব্ব উৎসাহের প্রদীপ্ত জ্যোতিঃ খেলিয়া বেড়াইতেছিল,—সে কহিল "আমার জন্য কোন চিন্তা করবেন না। শুধু অনুমতি দিন, আপনার আদেশ পালন করি।"

কাপ্তেন কহিলেন—"এই গোলাগুলির ভিতর আমি তোমাকে কোন মতেই জীবন বিপদাপন্ন করে এমন অসমসাহসিকতার কাজ করতে আদেশ দিতে পারি না, তবে তুমি যদি স্বেচ্ছায় যাও আমি তোমাকে বাধা দোব না।

সুধীর হাসিয়া কহিল—"আপনার এই আদেশটার জন্যই আমি অপেক্ষা কচ্ছিলুম।"

বাহিরে বন্দীদের যাহারা পাহারা দিত, তাহারা সকলেই যে কয়জন বন্দী বাঙ্গালী সৈন্য ছিল তাহাদিগকে ভালবাসত। সুতরাং তাহাদের সহিত অতি সরলভাবে মেলামেশা করিত—ইংরেজ সিপাহীর সাজ পোষাক পরা মূর্ত্তি দেখিয়া যদিও ভয়ের উদ্রেক হয়, কিন্তু সাক্ষাৎভাবে আলাপ করিতে গেলে যেমন তাহাদের ভিতর ভয়ের কোন কারণই থাকে না,

তেমনি এই তুর্কী প্রহরীদের বাহিরের খোলসটা খুব ভীতিজনক হইলেও তাহাদের অন্তর বেশ কোমল এবং স্নেহপূর্ণ ছিল।

সুধীর ক্যাম্পের বাহির হইতেই একজন তুর্কী প্রহরী জিজ্ঞাসা করিল "কে তুমি? কোথায় যাচ্ছ?"

সুধীর হাসিয়া কহিল—"মরতে যাচ্ছি।"

"মরতে এত সাধ কেন? আমরাত জানি বাঙ্গালাদের মরবার সাহস নাই।"

সুধীর গর্জ্জিয়া কহিল—"সাহস যদি নেই, তবে তারা যুদ্ধ করতে এল কেন? তাদের বীরত্ব দেখছ ত?"

তারপর বলিল—"তোমার সঙ্গে তর্কের প্রয়োজন নেই, দেখ আমরা সবগুলো লোক না খেয়ে মরতে চলেছি, খাবার এ কষ্ট আর সইতে পারছিনি। অই যে ছোট পাহাড়টীর নীচে ফলের বাগানটী আছে আমি সেখানে থেকে ফল ও সাক্-সবজী আনতে চাই, বলি, যেতে দেবে ত?"

তুর্কী সৈন্য সুধীরের কথা শুনিয়া খানিকক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া কহিল—"বল কি? যদি ধরা পড়, তার পর যে রকম গোলাগুলি চলছে, আর এই অন্ধকার শীতের রাত্রি, তোমার অজানা দেশ, দূরও আধ ক্রোশের কম হবে না, কি করে যাবে? ওখান থেকে সাক্-সবজী নিয়ে যে নিরাপদে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পারবে তা ত আমার মনে হয় না।"

"এই দেখ, আমরা বাঙ্গালী মরতে ভয় পাই না। তুমি এক কাজ কর, তোমার অই চোরাই লণ্ঠনটা মাটীর সঙ্গে ছু করে ধর, আর সোজা পথটা একটু দেখিয়ে দাও।"

দুই জন তুর্কী প্রহরীতে এখন কথা হইল। দ্বি[illegible]জন কহিল—

[illegible] কটা উল্টো পথ দেখিয়ে, মরুকগে নদীটা[illegible] ভিতর ডুবে, এ

হতভাগা বন্দীর দল যে কোন রকমে সরে গেলেই যে আমাদের কাঁধের ভারটা অনেক কমে।"

প্রথম প্রহরী কহিল—"ছিঃ বেচারারা দূর দেশে যুদ্ধ করতে এসেছে, তাদের কি আর অমন করে নিষ্ঠুর কথা বলতে হয়। দেখতে পাচ্ছ, এরা কি রকম সাহসী।" তার পর প্রথম প্রহরীটী সুধীরকে পথের কথা বলিয়া দিয়া কহিল—"খুব সাবধানে চুপি চুপি যেও, আমি তোমাকে ছেড়ে দিয়েছি, এ কথা প্রচার হলে আমাদেরও শির যাবে, তোমারও প্রাণ যাবে। খুব সাবধান ভাই!"

ধীরে ধীরে সুধীর ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া ছোট পাহাড়টী লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিল। এ সময়ে উপর দিয়া একটা জেপিলিন বোঁ বোঁ করিয়া 'সার্চলাইট' ফেলিয়া চলিয়া গেল—সহসা অস্বাভাবিক-রূপে গোলাগুলি চলিতে সুরু করিল; কখনও শরীরের পাশ দিয়া, কখন মাথার উপর দিয়া এইভাবে নক্ষত্র গতিতে গোলাগুলি চলিতেছিল। সুধীর নিরুপায় হইয়া কখনও হামাগুড়ি দিয়া, কখনও শুইয়া বুকে হাঁটিয়া—অতি কষ্টে প্রায় এক মাইল দূরবর্ত্তী বাগানের সম্মুখে যাইয়া পঁহুছিল—বাগানের সম্মুখে একটী ছোট ঝরণা ঝির ঝির করিয়া বহিয়া যাইতেছিল। সে যখন বাগানের ঠিক্ দরজার সম্মুখে পঁহুছিল, তখন গভীর রাত্রি, গোলাগুলি আর চলিতেছে না, সুধীর একবার উৰ্দ্ধদিকে চাহিয়া শঙ্কাহরণ ভগবানের নাম স্মরণ করিল। বাগানের দরজা খোলা রহিয়াছে, প্রহরী নাই, প্রহরীরা প্রাণভয়ে বাগান ছাড়িয়া পালাইয়া গিয়াছে। বাগানটী স্তিমিত নক্ষত্রালোকে সুধীর যতদূর দেখিতে পাইল তাহাতে তাহার মনে হইল যে ইহা কোন ধনীর বিলাস উদ্যান, সাজ-সজ্জার কোন অভাব নাই। বাগান দেখিবার সময় এ নয়, সুধীর আর কোনরূপ সময় নষ্ট না করিয়া যতদূর পারিল ফল ও সাক্ সবজী সংগ্রহ

করিয়া আবার ক্যাম্পের দিকে চলিতে লাগিল। পাঁচজন লোকের পক্ষেও যে বোঝা বহিয়া লইতে গুরুতর কষ্ট হয়, সুধীর দুঃসাহস করিয়া একাই সেইরূপ বিরাট বোঝা, দ্রাক্ষালতা, পরিত্যক্ত ছিন্ন বস্ত্র ইত্যাদির সাহায্যে বাঁধিয়া লইয়া অতি কষ্টে ধীরে ধীরে ক্যাম্পের দিকে চলিতে লাগিল। সৌভাগ্যক্রমে রাত্রির শেষ প্রহরে আগের মত গোলাগুলি চলিতেছিল না, —সে শুধু পথ হারাইবার ভয়ে অদূরবর্ত্তী ক্যাম্পের সম্মুখস্থ আলো দুইটীর দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিয়াছিল।

ক্লান্ত ও একরূপ চলচ্ছক্তিহীন অবস্থায় সে যখন বিবিধ ফল ও সাক্-সবজীর বোঝা লইয়া শিবিরে প্রবেশ করিল—তখন সকলে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। যে দুই চারিজন বন্দী বাঙ্গালী সৈন্য ছিল তাহারা প্রাণ-পণে সুধীরের শুশ্রূষা করিতে লাগিল। কাপ্তেন সাহেব তাহার এইরূপ সাহসিকতা দেখিতে পাইয়া বিস্মিত হইয়া কহিলেন—"তুমি সত্য সত্যই সৈনিকের উপযুক্ত। ঈশ্বর তোমাকে দীর্ঘজীবি করুন।"

সুধীর তখন অনেকটা সুস্থ হইয়াছিল—সে উঠিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কহিল—"আমি লেখাপড়া শিখিনি, মূর্খ, অন্ততঃ দেশের সেবা করবার মত শক্তিও বিধাতা আমায় দিয়েছেন। আমি বাঙ্গালী—বাঙ্গালীর বীর-গৌরবে পৃথিবী ধন্য হয়, ইহাই আমার প্রাণের কামনা।" সাহেব হাসিয়া কহিলেন—"তোমাদের গৌরবের, তোমাদের বুদ্ধিমত্তার এক দিন নিশ্চয়ই আদর হবে।"

বাঙ্গালা সৈনিকেরা কহিল—"তাহা হইলেই আমরা ধন্য হব।"

২২

রমণীবাবু, প্রভাতের নিকট ষ্টেটের সমুদয় অবস্থা শুধু মুখে শুনিয়া নয়, কাগজ পত্রে দেখিয়া ও কুমুদিনীর নিপুণতায় বুঝিতে পারিয়া বিস্মিত হইয়া মহিমবাবুকে কহিলেন "মহিমবাবু, আপনার কি কোন কথা বল্‌বার আছে ?"

মহিমবাবু কহিলেন—"আজ্ঞে হাঁ্যা, এ সমুদয় কাগজপত্রের গোলমাল তহবিল তছরূপ ও অন্যান্য যে সব অপরাধ দেখ্‌তে পেয়েছেন, এ সকলের জন্য আমি যত না অপরাধী, তার চেয়ে সহস্রগুণ অপরাধী এই পাপিষ্ঠ, বিশ্বাসঘাতক কুমুদিনী, আমি কুমুদিনীর পরামর্শ মতই সব কাজ করেছি। এটা কথনও সম্ভবপর নয় যে একজন কর্ম্মচারী—অন্যের, বিশেষতঃ নিজ অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের উপর নির্ভর ও বিশ্বাস না করে কাজ কর্‌তে পারেন ?"

প্রভাত কহিল—"সে কথা সত্য, কিন্তু যুদ্ধে যখন হার হয়, তখন দোষ কি সৈন্যদের উপর পড়ে, না সেনাপতির হয় ? জয়েও যেমন সেনাপতির গৌরব, পরাজয়েও তেমনি সেনাপতিরই অগৌরব ঘটে।"

মহিমবাবু আর কোন কথা বলিলেন না, কুমুদিনী কহিল—"ম্যানেজার বাবু, আমি সামান্য মুহুরী, আমার টাকায় লোভ হওয়ার সম্ভব, কিন্তু আপনার সে দোষ কেন হল। কই, আপনার সংসারও ত তেমন্ বড় নয়, সবে একটী স্ত্রী—বিধাতা একটী সন্তানও দেন নাই। আপনিই না পূর্ব্বের দেবতুল্য ম্যানেজার বাবুকে হীনভাবে অপমানিত করবার চেষ্টা করেছিলেন, আমাদের রাজা বাহাদুর নিজে কিছু দেখেন নাই, কাকেও বিশ্বাস করেন নাই, তার ফল এখন হাতে হাতে পাচ্ছেন। আমি দোষী, আমি মনিবের অনেক টাকা খেয়েছি, কিন্তু আপনার মত অন্যায় ভাবে নয়। বলুন আপনি সকলের সামনে, আমি বরাবর বলেছি কিনা যে মনিবের সর্ব্বনাশ করবেন না, আমার সে কথা আপনি শোনেন নি, আপনি আমায় দোষ দিচ্ছেন, বেশ, কিন্তু জাল কর্‌বার হুকুম দিয়েছেন আপনি, জাল করেছি আমি। আপনাকে সময় সময় টাকা পয়সার দেনা-পাওনায় যে ঠকিয়েছি সে কথাটা আমি স্বীকার করি। আমি আর চাকরী করবো না—এক দিকে চলে যাব। তাই আসুন দু'জনে যে পাপ করেছি, সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি।"

মহিমবাবু কহিলেন—"আমি নির্দ্দোষ, আদালতের ন্যায্য বিচারে যদি আমি দোষী সাব্যস্ত হই, তা'হলে, যে কোন শাস্তিই হউক না কেন, মাথা পেতে নেব। তার আগে—আমি দোষী একথা সম্পূর্ণ ভাবে স্বীকার করতে রাজি নই।

প্রভাত কহিল—"আমাদের ইচ্ছা নয় যে আপনার বিরুদ্ধে একটা মোকদ্দমা করি। আপনি কুমুদিনীর ন্যায় সরলভাবে অপরাধ স্বীকার করুন, বাবাকে অনুরোধ করবো তিনি যাতে আপনাকে ক্ষমা করেন।"

মহিমবাবুর মনে মাঝে মাঝে ইচ্ছা হইতেছিল যে এক্ষণে সমুদয় অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাহেন, এমন সদাশয়, দয়ালু মনিব, কিন্তু তাহার মাথায় সয়তানের চাকা ঘুরিতেছিল, কোনমতেই অপরাধ স্বীকার করিবার সাহস তাহার হইল না। কুমুদিনীর বিশ্বাস ঘাতকতায় মহিম-বাবুর মন ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।

রমণী বাবু কোন কথা বলিতেছিলেন না। তাঁহার মনে একটা পরাজয়ের অপমান খেলিয়া বেড়াইতেছিল। বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান ও জমিদারী কার্য্যে পারদর্শী বলিয়া মনে মনে তাঁহার বড় অহঙ্কার ছিল, প্রভাতের কাছে তাঁহার সেই অহঙ্কার দূর হইল।

প্রভাত কহিল—"মহিমবাবু, আমি ও কুমুদিনী হিসাব করে দেখলুম, বাবা নিজ কার্য্যে ও অন্যান্য পার্টি ও চাঁদা ইত্যাদিতে যে সব দান করে-ছেন, সে সব ছাড়াও আপনারা নানাভাবে যে পরিমাণ ঋণের বোঝা চাপিয়েছেন, তার বোধ হয় এক তৃতীয়াংশ আপনাদের বড়যন্ত্রে হয়েছে। সে কথা যাক্ আপনাকে শাস্তি দেওয়ালেই যে আমাদের টাকা আদায় হবে তারত কোন সম্ভাবনা নেই। তবে আমি প্রজাদের মন বুঝে এসেছি, এ ঋণ তারাই শোধ করে দেবে।" তারপর প্রভাত রমণীবাবুর দিকে মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া কহিল—"বাবা, আপনার একটা অনুমতি চাই।"

রমণী বাবু গম্ভীর স্বরে কহিলেন—"কিসের অনুমতি বাবা ?"

"আমি মহিমবাবুর ক্ষমা ভিক্ষা করি। ভদ্র লোকের চরিত্রের বিরুদ্ধে একটা গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করে তাঁকে সংসারের দশজনের চক্ষে ঘৃণিত করা আমার অভিপ্রায় নয়। আপনি বলুন—আমি তাঁকে এক্ষণি বিদায় দিই।"

"সে আর আমাব অনুমতি কি বাবা, তোমার যা ভাল মত হয় তাই কর।" আজ বৃদ্ধ সম্পূর্ণরূপে পুত্রের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন।

প্রভাত কহিল—"মহিমবাবু! যা হবার হয়েছে—আপনি এখন সম্পূর্ণ মুক্ত, আপনার যেখানে ইচ্ছা সেখানে যান।"

মহিমবাবু একটী কথাও বলিলেন না, ধীরে ধীরে বাহিরে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় রমণীবাবুকে একটা নমস্কার পর্য্যন্ত করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

রমণীবাবুর ও প্রভাতের এইরূপ মহত্ত্ব দেখিতে পাইয়া কুমুদিনী কাঁদিয়া ফেলিল—উভয়ের পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল—"আমি মাতাল, দুশ্চরিত্র, আমি অনেক অন্যায় করেছি, আমার সব অপরাধ ক্ষমা করবেন।"

রমণীবাবু কহিলেন—"কুমুদিনী! বিশ্বাসের উপরই পৃথিবী চলে আসছে, যেখানে বিশ্বাস ভেঙ্গে যায়, সেখানে কোনদিন উন্নতি বা জাতি জেগে উঠেনা। আমাদের বাঙ্গালী জাতির পরস্পরে বিশ্বাস নেই বলেই এত অধঃপতন। যদি বিশ্বাস থাকৃত, আমরা মানুষ হতেম, তাহলে আমাদের ন্যায় জমিদারের জমিদারী যেত না, ব্যবসা ফেইল হত না, যৌথ-কারবারগুলির টাকার হিসাব পাওয়া যেত। চিরদিন বাপ পিতামহ প্রজা ও আমলা কর্ম্মচারীদের ক্ষমা করেই এসেছেন। কেবল যে দোষ তোমাদের তা নয়—আমরাও সম্পূর্ণ দোষী। মনিব হয়ে প্রজার কল্যাণ দেখিনি, তাদের অবস্থার খোঁজ করিনি, শুধু নিজ স্বার্থ দেখেছি। তার পরিণাম যদি এ রকম না হয়, তবে আর কিসে হবে ?"

পাষাণও দ্রবীভূত হয়, কুমুদিনীর পাষাণ হৃদয়ও গলিতে আরম্ভ করিল —কিন্তু মহিমবাবুর গলে নাই। কুমুদিনী রমণীবাবু ও প্রভাতের পদধূলি লইতে গেলে রমণীবাবু তাহার মস্তক স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

প্রভাত কহিল—"বাবা! আমার মনের গতি পরিবর্ত্তিত হয়েছে। আমি দেশে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি—তাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে, আমার চাকরী বা বাহিরে ব্যবসা বাণিজ্য করবার কোন প্রয়োজন নেই। নিজ জমিদারীর তত্ত্বাবধান, প্রজার কল্যাণ সাধন, তাদের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রচলন এ সব কাজ যদি করতে পারি, তা হলেই দেশের কল্যাণ হবে। পল্লী সমাজের বুকে যে অনন্ত রত্নরাজি লুকিয়ে আছে, আমাদের সেই রত্ন আহরণ করতে হবে। পল্লী-রমণীর বুকের মধ্যে যে স্নেহের মন্দাকিনী বয়ে যাচ্ছে, সে স্নেহ মন্দাকিনীর ধারা জগতের কল্যাণ কামনায় উৎসারিত করতে হবে। যে অযত্ন পালিতা ভূমি-মাতা অস্থি পঞ্জরময় বুকে হাহাকার কচ্ছেন, তার সেই দীর্ণ বক্ষের উপর অন্নপূর্ণা মাতার পুণ্যতীর্থ গড়ে তুলতে হবে। বাবা! দেশকে শুধু বাক্যে নয় কার্য্যে, প্রজাদের শুধু স্বার্থসিদ্ধির জন্য সন্তান বলে সম্বোধন করে নয়, খাঁটি আগ্রহের সহিত, প্রীতির সহিত—স্নেহের সহিত আপনার সন্তান, ভাই ও বন্ধু করে গড়ে তুলতে চাই।"

রমণী বাবুর দুই চক্ষু বাহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছিল, তিনি গদ্গদ্-কণ্ঠে কহিলেন—"যে কাজ আমি করতে পারিনি, যে কাজ করতে আমার প্রবৃত্তি হয় নি, তুই সেই কাজ কর বাবা! আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর।" কুমুদিনী কহিল—"খোকা বাবু!. আমিও আপনার সঙ্গী হয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবো।"

২৩

মিঃ চৌধুরীর পত্র পাইয়া একদিন ভোরের বেলা গুরুপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী

রমণী বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মিঃ চৌধুরীর কন্যার সহিত প্রভাতের বিবাহের সম্বন্ধের কথাটা উপস্থিত করিলেন। রমণী বাবু কহিলেন—তাঁরা কি হিন্দু মতে কন্যার সম্প্রদান করতে রাজি হবেন ?"

গুরুপ্রসাদ বাবু কহিলেন—"হিন্দুমতে কন্যা সম্প্রদান করবার ত কোন আবশ্যক হবে না, কারণ আপনার ছেলে বিলেত ফেরত, তারপর আপনি নিজেও নামে হিন্দু-সমাজের অন্তঃভুর্ক্ত হলেও সমাজের কোন কুসংস্কার-কেইত মাথা পেতে মেনে নিচ্ছেন না, জানেন কি রমণী বাবু, বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষিত সম্প্রদায় উদার ব্রাহ্ম-সমাজের আশ্রয় পেতে সম্পূর্ণ ভাবে ইচ্ছুক, কাজেই এ বিবাহ ব্যাপারে যদি প্রভাত বাবাজী ব্রাহ্ম মতে পরিণীত হন, সেটা তাঁর পক্ষেও সাহসিকতার পরিচায়ক হবে, আর আপনাদেরও গৌরবেরই হবে।"

"দেখুন, ধর্ম্ম বা সমাজ নিয়ে তর্ক চলে না। আমি উদারতা জিনিষটাকেই ভালবাসি। কোন সমাজ বা ধর্ম্মের নিন্দা করে যাঁরা সমাজে শ্রেষ্ঠ হতে চান, আমি তাঁদের ঘৃণা করি। আমাদের দেশে একেত জাতিভেদের নিগড়-বন্ধন, তার উপর ধর্ম্মের বা অনুষ্ঠানের শত রকমের পার্থক্য আমাদের পরস্পরের মধ্যে যে কত বড় প্রভেদ সৃষ্টি করেছে, সে কথা বলে বোঝান যায় না। আপনার মত একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির কাছে কোনরূপ সঙ্কীর্ণতা আশা করি না।"

গুরুপ্রসাদ বাবু হা! হা! করিয়া উচ্চ-হাস্য করিয়া কহিলেন—"আপনার কাছে অনেক উপদেশ পেলেম, ভগবানের ইচ্ছা যে আমি নিয়ত লোক-সমাজে মিশে শিক্ষালাভ করি, তাঁর সেই শুভ ইচ্ছা যে কত দিকে কত ভাবে প্রেরণা এনে দিয়ে সফল করে, সে কথা কেউ জানে না। আর একটা কথা বলছিলুম কি রমণী বাবু—অবশ্য আপনি যদি কিছু মনে না করেন,—

এই কথায় রমণীবাবু কহিলেন—"কিছু মনে করবার আমার নেই—আপনি স্বচ্ছন্দে আপনার বক্তব্য বলে যেতে পারেন, বিশেষ আপনি ত একটী শুভ বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন।"

"তাত বটেই। শুনেছি আপনার কিছু ঋণ আছে ?"

রমণীবাবু মুখ বিকৃত করিয়া কহিলেন—"তার সঙ্গে এর কি সংস্রব ?"

"সংস্রব নেই, তবে এ শুভ পরিণয় হলে সেদিকেও আপনার যথেষ্ট সাহায্য হতে পারত, মিঃ চৌধুরীর পত্রে আমি এরূপ একটা সুস্পষ্ট আভাষও পেয়েছি।"

"তিনি কি করে সাহায্য করবেন ?"

"আপনার বোধ হয় অজ্ঞাত নেই যে মিঃ চৌধুরী একজন সুপ্রসিদ্ধ ধনী ব্যবসায়ী, তাঁর অর্থের কোন অভাব নেই, আপনার ঋণের যতটাই পরিমাণ হউক না কেন তিনি অনায়াসেই তার ব্যবস্থা করতে পারবেন ?"

"কোন্ স্বার্থে ?"

"নিজ কন্যা জামাতার স্বার্থে, নিজ কন্যা জামাতার কল্যাণের জন্ত তিনি একাজ করবেন।"

"আমি কেন এমন ভাবে তাঁর সাহায্য গ্রহণ করতে যাব ?"

"তাতে কোন অপরাধ নেই রমণী বাবু, আপনি ত আর চিরদিনের জন্ত দান গ্রহণ কচ্চেন না, ক্রমে ক্রমে তাঁর ঋণটা সুধে ফেল্‌বেন। সুবিধার মধ্যে আপনাকে হয়ত সুদটা দিতে হবে না।"

মিঃ চৌধুরী রমণী বাবুর বিষয় সম্পূর্ণরূপ অনুসন্ধান করিয়া তাহার অবস্থার কথা জানিতে পারিয়াছিলেন। মানব চরিত্রাভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে লোক চরিত্রের ইতিহাস যেমন সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইয়া উঠে, সাধারণের পক্ষে তাহা হয় না। তৃষ্ণার্ত্ত পান্থের নিকট পাণীয় জল যেমন প্রীয়, রোগীর কাছে কুপথ্য যেমন প্রীয়, তেমনি ধনী ব্যক্তির কাছে অর্থের

প্রলোভনটা বড় বেশী প্রলোভন। গুরু প্রসাদ বাবু ধর্ম্ম প্রচারক হইলেও সুচতুর সংসারাভিজ্ঞ ব্যক্তি, তিনি প্রতিমুহূর্ত্তে রমণী বাবুর মুখের পরিবর্ত্তন লক্ষ করিতেছিলেন। চৌধুরী সাহেব মিসেস চৌধুরীর প্ররোচনায় এইরূপ একটী সম্রান্ত পরিবারে কন্যা সম্প্রদানের জন্যও বিশেষরূপ সমুৎসুক হইয়া উঠিয়াছিলেন, সে যে ভাবেই হউক। এই ঋণদানের কৌশলটাও তাঁহার উপদেশ মতেই গুরু প্রসাদ বাবু উত্থাপন করিয়াছিলেন।

রমণী বাবু কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া ধীরস্বরে কহিলেন—"এতটা অনুগ্রহ কি চৌধুরী সাহেবের হবে?"

চতুর গুরু প্রসাদ ঔষধ ধরিয়াছে মনে করিয়া হাসিয়া কহিলেন—"অনুগ্রহ কি? এযে তার কর্ত্তব্য। আত্মীয় বন্ধু বান্ধব যদি আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবকে সাহায্য না করে তাহলে যে পৃথিবীতে বাস করাই দুঃসহ হয়ে উঠে। এজন্য আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।"

রমণী বাবু কহিলেন—"আমি ঋণগ্রস্ত, বিপন্ন,—সম্পত্তি যায় যায় অবস্থা হয়েছে। তবে এ বিষয়ে আমার দুটী কথা,—এক বিবাহ হিন্দু মতে হবে, দুই,—পুত্রের অভিপ্রায় গ্রহণ না করে আজ আপনাকে শেষ মতামত প্রকাশ করে বল্‌তে পাচ্ছিনা; হয়ত আমি আপনাকে কথা দিলুম, শেষটায় ছেলে বেঁকে বস্‌লো। কাজেই তাঁর সঙ্গে পরামর্শ না করে কোন কথা আমি বল্‌তে ইচ্ছা করি না।"

গুরুপ্রসাদ বাবু হাসিয়া কহিলেন—"সে বিষয়ে আপনি ব্যস্ত হবেন না, বাবাজীর, মা অনীতাকে অপছন্দ হবার কোন কারণ নাই।" গিরিডিতে অনীতার সহিত যে প্রভাতের সাক্ষাত পরিচয় ইত্যাদি হইয়া গিয়াছে, সেকথাত আর গুরুপ্রসাদ বাবুর অজ্ঞাত ছিল না।

মিঃ চৌধুরির প্রতি গুরুপ্রসাদ বাবুর আসক্তির অন্যতম কারণ এই যে যদি তিনি তাহার কন্যার এই সম্বন্ধ স্থির করিয়া দিতে পারেন তাহা

হইলে পুরস্কারের পরিমাণটা একটু বেশী রূপেই হইবে। এই লাভের আশাটা তাহাকে প্রতিনিয়ত আশার রথে চড়াইয়া রমণী বাবুর বাড়ীতে প্রায় প্রত্যহ আনাগোনা করাইতেছিল।

গুরুপ্রসাদ বাবু যাইবার সময় কহিলেন—"তাহলে আমি মিঃ চৌধুরীকে কি লিখ্‌বো বলুন ?"

"তাড়াতাড়ি না লিখ্‌লেই কি হয় না ?"

"সে কি করে হবে ? কন্যাদায় সব সমাজেই সমান, তবু হিন্দু সমাজ বৃহৎ বলে ছেলের জন্য ততটা বেশী বেগ পেতে হয় না, কিন্তু আমাদের ব্রাহ্ম সমাজের ভয়ানক অসুবিধা।"

রমণীবাবু কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "প্রভাত এখন দেশে আছে, সে ফিরে এলে তার সঙ্গে পরামর্শ করে যা হয় শেষ কথাটা আপনাকে জানাব, আমার পক্ষে শেষ মীমাংসায় পৌছানটা ভাল মনে হয় না।"

"তা ঠিক্ বটে, কিন্তু প্রভাত যেমন ছেলে, সে কখনও আপনার কোন আদেশকে হেলা করবে—সে অসম্ভব।"

রমণী বাবু মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন—"সে আমি জানি, তবু পুত্রের যেমন পিতার প্রতি একটা কর্ত্তব্য আছে, তেমনি পিতারও পুত্রের প্রতি একটা কর্ত্তব্য আছে, শিক্ষিত উপযুক্ত সন্তানের সঙ্গে যে বন্ধুবৎ ব্যবহার করা শাস্ত্রের উপদেশ আছে, আমার মনে হয়, সে কথাটা খুবই মূল্যবান্।"

"নিশ্চয়! আচ্ছা, আজ আমি আসি। আবার কয়েক দিন পরে এসে সাক্ষাৎ করবো।" গুরুপ্রসাদ বাবু চলিয়া গেলে রমণী বাবু একাকী গভীরভাবে বহুক্ষণ চিন্তা করিলেন—এই দারুণ ঋণের বোঝা, সম্পত্তি যায় যায়, মহাজনেরা আসল টাকা অপেক্ষাও সুদের মায়া যে কত বেশী করেন, তাহা প্রত্যহ তাহাদের নিকট হইতে সুদের তাগিদ সহিতে সহিতে বিশেষরূপেই উপলব্ধি করিয়াছেন। যদি এইখানে বিবাহ হয়, তাহা

হইলে ঋণের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া মাথা খাড়া করিবার পথ প্রশস্ত হয়, বিনা সুদে টাকাটা পাওয়া গেলে—সম্পত্তির আয় হইতে ধীরে ধীরে ঋণ শোধ করাটা তেমন অসুবিধা হইবে না। তারপর সমাজ—সমাজের কথা মনে করিয়া, সমাজের ভয়ে ভীত হইয়া কি আজ কাল চলে। উঃ ঋণ—ঋণ—ঋণ—ঋণের হাত হইতে মুক্তি পাইবার এই সহজ উপায়টা যাহা বিধাতার দান বলিয়া মনে হইতেছিল, তাহা কোনরূপেই উপেক্ষা করা চলে না। রমণী বাবু নিজ মনের সহিত লড়াই করিয়া যখন এইরূপ একটা স্থির সিদ্ধান্তে পঁহুছিয়াছিলেন, তাহার কয়েক দিন পরেই প্রভাত জমিদারী হইতে নানা হাঙ্গামার মস্ত বড় বোঝা লইয়া আসিয়া কলিকাতা উপস্থিত হইল। রমণী বাবু এ সকল অশান্তি উপদ্রব আদৌ পছন্দ করিতেন না। প্রভাতের ও দিকে মনোযোগ দেখিয়া তিনি অন্তরে আশান্বিত হইয়াছিলেন। প্রভাত সম্পত্তি রক্ষা করিয়া পিতাকে ঋণের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য উদ্‌গ্রীব দেখিয়া তাহার প্রাণে অত্যন্ত আনন্দ হইয়াছিল। চারিদিকের বিলি ব্যবস্থা ও পরামর্শের কাজ শেষ হইয়া প্রভাত একটু নিশ্চিন্ত হইলে—রমণী বাবু কহিলেন—"বাবা, তোমায় একটী কথা বল্‌বো।"

ঋণ-গ্রস্ত, বিপত্নীক পিতার প্রতি প্রভাত ইদানীং একটুকু বেশীরূপ ভক্তি-পরায়ণ হইয়া উঠিয়াছিল। এই সরল, উদার বৃদ্ধ—যিনি কোনদিন সংসারের কাহাকেও অবিশ্বাসের চক্ষে দেখেন নাই, তাহাকে প্রবঞ্চণা করা যে কত বড় পাপ—কত বড় অন্যায় এবং ঐরূপ পাপীদের যে কত বড় গুরুতর শাস্তি হওয়া উচিত তাহা সে ধারণা করিয়াই উঠিতে—পারিতেছিল না। প্রভাত পিতার প্রশ্নের উত্তরে কহিল—"কি কথা বাবা?" সে এমনি মধুর স্বরে কথা কয়টী কহিল যে রমণী বাবুর চিত্ত স্নেহরসে অভিষিক্ত হইয়া গেল। তিনি একে একে গুরুপ্রসাদ বাবুর

সহিত যে সব কথা হইয়াছিল তাহার এক কণাও রাখিয়া ঢাকিয়া নাবলিয়া সরলভাবে সব কথা বলিয়া শেষটায় কহিলেন—"তুমি আমার উপযুক্ত সন্তান, তোমার যে রকম অভিপ্রায়, সেই অনুসারেই আমি কাজ করবো।"

প্রভাত মাথা নত করিয়া বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিল—"বাবা! পিতৃঋণ—কেউ কোনদিন জীবনে শোধ করতে পারে না, আমি জানি আপনি কত কষ্টে আমাকে বাপ-মায়ের মিলিত স্নেহে পালন করে মানুষ করেছেন। আপনার বাক্য আমি লঙ্ঘন করতে পারি না। তারপর একটা কথা ভেবে দেখ্‌বেন—মানের চেয়ে কিছুই বড় নয়। চিরদিন মাথা উঁচু করে চলেছেন—পাহাড়ের চুড়ার মতন শত আঘাতেও টলেন নি। স্বীকার করি—এ বিবাহ হলে আপনি ঋণের হাত থেকে উদ্ধার হবার একটা পথ পাবেন, কিন্তু যখন সমাজের দশজনে বলবে—ঋণের দায়ে আপনি আপনার ছেলেকে বিক্রী করেছেন—সে বিক্রীর কাঞ্চন-মূল্যও কম নয়, তখন আপনি কি জন-সমাজে মুখ দেখাতে পারবেন? তখন কি লজ্জায়—ঘৃণায়—অপমানে আপনার মাথা নীচু হয়ে যাবে না? পুত্র—পিতার গৌরব বৃদ্ধি না করে যদি অপমান সৃষ্টির কারণ ঘটায় তার চেয়ে আর কি লজ্জা হতে পারে। ঋণ—সে আমি জানি। যেমন করে হর—মাথায় মোট বয়ে পর্য্যন্ত শোধ করবো, কিন্তু বাবা মান গেলে আর মান ফিরে পাবেন না,—টাকা আসে—টাকা যায়, আবার আসে, কিন্তু কেউ কখনও মান খুইয়ে মান ফিরে পেয়েছে কি?

"তারপর হাঁ, আমি—মিঃ চৌধুরীর মেয়েকে দেখেছি, মেয়ে শিক্ষিতা স্বীকার করি, কিন্তু যে মেয়ে জেনে আস্‌বে যে তার পিতার অর্থ আমাকে কিনে নিয়েছে বিপদের হাত থেকে উদ্ধার করেছে, সে যদি হাজার ভালও হয়, তবু তার মন থেকে অহঙ্কারের ভাব কোনমতেই দূর হবেনা। সে প্রভুত্ব জিনিষটাকেই শ্রেষ্ঠ আসন দিতে যাইবে। সে

আমাকে দেখ্‌বেনা, বাবা, তোমাকেও দেখ্‌বেনা। সে ঘরের সেবা-পরায়ণা—স্নেহ-পরায়ণা বধূ হবে না, হবে তেজস্বিনী গর্ব্বিতা—উদ্ধতা নারী, সে চাইবে সুধু আদেশ কর্‌তে, আদেশ মান্‌তে চাইবে না।"

প্রভাতের কথা শুনিয়া রমণী বাবুর মনে তাহার প্রত্যেকটী কথাই অত্যন্ত সঙ্গত বলিয়া মনে হইল, তিনি কহিলেন—"আমি এতটা ভেবে দেখিনি বাবা। তুমি যা ভাল বোঝ কর, তবে ঋণের জ্বালা!"

"সেজন্য আপ্‌নি ভাব্‌বেন না। আমি ব্যবসার জন্য নিজের ব্যবসা ছেড়ে আর বাইরে দৌড়াব না। আমি আমার দেশকে চিনেছি প্রজাদের প্রাণ জেনেছি—ঋণের ভয় করি না। আমি আর একটা কথা বল্‌বো—আমার বিবাহে অমত নেই—পূর্ব্বের সেই সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেছি। যদি বিবাহ করি—গরীবের ঘরে বিবাহ কর্‌বো। বাবা! আমি একটা কথা আপনাকে নির্লজ্জের মত বল্‌ছি—আমি আপনার বাল্য বন্ধু চন্দ্রকান্ত বাবুর মেয়ে প্রভাকে বিবাহ করবো মনে মনে সঙ্কল্প করেছি—চন্দ্রকান্ত বাবুও তোমারি মত উদার, মহৎ ও ঋণী। তিনিও ঠকেছেন, আপনিও ঠকেছেন আপনার যদি আমাকে বিবাহ করাবার ইচ্ছা হয়ে থাকে, তা হলে তাঁর মত নিতে পারেন।" প্রভাত আর কোন কথা না কহিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। রমণী বাবুর দুইচোখ বহিয়া আনন্দাশ্রু পড়িতে লাগিল। এমন দিনে আজ প্রভাতের মা কোথায়?

(২৪)

গুরুপ্রসাদ বাবুর চিঠি যখন মিঃ ও মিসেস চৌধুরীর হস্তগত হইল, তখন তাঁহারা বিস্মিত ও দুঃখিত হইলেন। অনীতার কাছে কথাটা গোপন করিবার চেষ্টা করিলেও, বাঙ্গালীর ঘরে যেমন হয় কথাটা গোপন রহিল না। অনীতা যে খুব দুঃখিতা হইল তাহা নহে, কারণ পিতামাতার শত আগ্রহ থাকিলেও তাহার প্রাণে যে প্রভাতের প্রতি-

খুব একটা গভীর প্রেমের আকর্ষণ হইয়াছিল তাহা নহে। সে যে ভাবে শিক্ষা পাইয়া আসিয়াছে, তাহার কোন আদর্শই সে প্রভাতের মধ্যে খুঁজিয়া পায় নাই। সে যে আনন্দ ও বিলাস বাসনাকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনারূপে গ্রহণ করিয়া জীবন পথে চলিতে সুরু করিয়াছিল—প্রভাত বিলাত ফেরত হইলেও তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল। কাজেই প্রভাতের পিতার অনিচ্ছা প্রকাশে তাহার পিতা মাতা যে পরিমাণে দুঃখিত হইয়াছিল, সে সেইরূপ হয় নাই, যদিও প্রভাতের রূপ ও শিক্ষার জন্য কিয়ৎ পরিমাণে আকৃষ্ট হইয়াছিল—প্রকৃত প্রেমের টানে নহে।

মিঃ চৌধুরী মিসেস্ চৌধুরীকে কহিলেন—"এই যে অনিচ্ছা প্রকাশ এটা আমি একটা অপমান বলে মনে করি।"

মিসেস্ চৌধুরী হাসিয়া কহিলেন—"কিসের অপমান? কন্যার উপযুক্ত পাত্র নির্ব্বাচনের জন্য নিয়ত বাপ মাকে কষ্ট সহ্য করতে হয়, তাতে অপমানের কি বলত? হ্যাঁ, ঘর বর সব সমান ছিল, তাই এদিকে একটু ঝোঁক দিয়েছিলুম।"

"তোমার কথায়ইত আমি ওদের কারবারের জন্য খেটেছিলুম, নহলে কে যেত অত সব হাঙ্গামা পোয়াতে?"

"তোমার মুখে একথা শোভা পায় না, যে পরের সাহায্যে বড় হয়ে দশের একজন হয়েছে, যে ব্যক্তি আজ কাল বাঙ্গালাদের মধ্যে বড় ব্যবসাদার নামে পরিচিত, তার মনে যদি একজন লোকের কোন উপকার করে একথা মনে আসে যে আগে এমন জানলে করতুম না, সে বড় লজ্জার কথা। পৃথিবীতে আঘাত পেতেও হয়,—কেবলি আরামেত দিন যায় না। আমার মেয়ের সঙ্গে বিবাহ হলে আমি যে সুখী হতেম তা নিশ্চয়, না হলেও আমি কখনও প্রভাতের প্রতি বিমুখ হব না। বরং যে জন্য সে অমত করেছে তাতে আমি তার প্রতি আরও বেশী শ্রদ্ধান্বিত হয়েছি।"

মিঃ চৌধুরী কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া কহিলেন—"আমি একবার চেষ্টা করে দেখবো কি ?"

"সে মন্দ হয় না।" কিন্তু চৌধুরীর পক্ষে সেইরূপভাবে আগ্রহান্বিত হইয়া এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়া যে কতদূর সম্ভবপর হইবে তাহাও মিসেস্ চৌধুরী বুঝিতেন। কাজেই তাঁহার এই আগ্রহে বাধা না দিয়া কহিলেন—"তুমি নানা কাজে ব্যস্ত থাক। বরং যতীন্ একবার গুরুপ্রসাদ বাবুকে সঙ্গে করে নিয়ে রমণী বাবুর সঙ্গে আলাপ করে দেখুক না, বোধ হয় এ পরামর্শই ভাল।" মিঃ চৌধুরী কোন কালেই এ সব দিকে বড় একটা মনোযোগ দিতে ভালবাসিতেন না, আর তার মনের মধ্যে বংশের অগৌরবের কথা প্রতি নিয়ত জাগিয়াছিল—পাছে কোনরূপে তাহা প্রকাশ পাইয়া লাঞ্ছনার একশেষ হয় এজন্যও তিনি সাবধানের সহিত দূরে দূরে থাকিতেন। যতীন পুনরায় যাহা করিবার করিয়া আসিবে তাহাই স্থির হইয়া গেল।

যতীন্ আজ কাল গিরিডি ছাড়িয়া যাইতে বড একটা ইচ্ছুক ছিল না সে উন্মাদের মত প্রভাকে ভালবাসিয়াছিল—প্রত্যহ প্রভাতে ও সন্ধ্যায় সে নিয়মিত ভাবে যাইয়া সেখানে উপস্থিত হইত। চন্দ্রকান্ত বাবু এই যুবকের প্রতি এতদূর স্নেহ পরায়ণ হইয়াছিলেন যে তাহাকে সম্পূর্ণ নিজ পরিবারের লোকের মত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। প্রভা পূর্ব্বে যতীন্ আসিলে যেমন চঞ্চল হইয়া উঠিত, কতক্ষণে সে কক্ষ ছাড়িয়া যাইবে সেজন্য ব্যস্ত হইত। চন্দ্রকান্ত বাবু তাহার ঐরূপ ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া একদিন বলিয়াছিলেন, "আমায় বিপদের হাত থেকে যে উদ্ধার করেছে, সে যদি কোন দিন কোন অন্যায় করে থাকে তাকি ভুলে যাওয়াই মনুষ্যত্ব নয় ? তুমি যতীনের প্রতি যে রকম ব্যবহার কর, কোন মানুষ সে রকম অভদ্র ব্যবহার কোন ভদ্র লোকের উপর করতে

পারবে না।" প্রভা কোন কথা কহিল না—গুরুভার মেঘের মত হৃদয়ে যাতনার পুঞ্জিভূত প্রলয় বেদনা বহন করিয়া নীরবে চলিয়া গেল। তারপর হইতে সে হাসি-মুখে যতীনকে অভ্যর্থনা করিত, যতীনের সহিত নানা বিষয়ে কথোপকথন করিতে কোন সঙ্কোচ বা বাধা প্রকাশ করিত না। বাণী বি, এ, পড়িতে চলিয়া গিয়াছে। গৃহস্থালীর কাজ আজ কাল প্রভার আগের মত করিতে হয় না। ভাল বয় ও খানসামা সংগ্রহ করিয়া নিযুক্ত করা হইয়াছে। এখন প্রভার কোন কাজ নাই—যে শিক্ষয়িত্রীর পদ-প্রার্থিনী হইয়া সে দরখাস্ত দিয়াছিল, সেখান হইতেও উত্তর আসিয়াছে যে তাহার ন্যায় উচ্চ-শিক্ষিতা বিধবা মহিলাকে নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা এই গ্রাম্য স্কুল-কমিটির নাই। হায়! নিষ্ঠুর পুরুষ! নারীর জীবন লইয়া নিষ্ঠুর খেলা করিবার জন্যই কি বিধাতা তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছে?

প্রভাতের ব্যবহার যে কত বড় অমার্জ্জনীয় সেকথা না বলিলেও চলে। আজ কাল চন্দ্রকান্ত বাবু অনেকটা ধীর ও শান্ত, তাহার মনের অশান্তি ও বিভ্রান্তিকা বহু পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। প্রভা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিল যে এইবার তাহাকে লইয়া এমন কিছু সমস্যা দাঁড়াইবে যাহার জন্য তাহার পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হওয়া দরকার। কোন্ পথে সে দাঁড়াইবে? সে যাহা মনে মনে সন্দেহ করিয়াছিল শেষটায় তাহাই সত্য হইয়া দাঁড়াইল। এখন এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল যে চন্দ্রকান্ত বাবু যতীনের কোন কথারই কোন প্রতিবাদ করিতেন না। একদিন যতীন প্রভাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিতেই চন্দ্রকান্ত বাবু কহিলেন—"সেত বেশ কথা। শুধু তুমি, প্রভার মতটা নাও। আমার কোন আপত্তি নাই।" পূর্ব্বে এইরূপ প্রস্তাব উত্থাপন করিতে যতীন্ কোন দিন সাহসী হয় নাই, কিন্তু সে যে পণ করিয়া এতদিন এই পরিবারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ

ঘুরিতেছিল, আজ তাহা সার্থক হইয়াছে। ঋণের দায়েই যে বৃদ্ধ আপনাকে সম্পূর্ণরূপে যতীনের হাতে ন্যস্ত করিয়া দিয়াছিল, তাহা সে বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিল। চন্দ্রকান্ত বাবুর সম্মতি পাইয়া যতীনের চিত্ত আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সে তাঁহাব পদধুলি মাথায় লইয়া কহিল—"প্রভাকে আপনিও জিজ্ঞাসা করবেন, আমিও জিজ্ঞাসা করবো। বোধ হয় তিনি আমাকে গ্রহণ কর্‌তে আপত্তি করবেন না।"

চন্দ্রকান্ত বাবু কহিলেন—"ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।"

২৪

প্রভা যখন পিতার কাছে যতীনের প্রস্তাবের বিষয় জ্ঞাত হইল, তখন সে মর্ম্মর প্রস্তর মূর্ত্তির মত অচলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার ঠোট স্ফুরিত হইল না, দেহ কম্পিত হইল না, শুধু মুখের উপর দিয়া একটা বিবর্ণ কাতর ভাব প্রকাশ পাইতেছিল। চন্দ্রকান্ত বাবু কহিলেন—"মা, তুমি কোন বাধা আপত্তি কর না। আমি আশীর্ব্বাদ কচ্চি, তুমি এ বিবাহে সুখী হবে। সে একদিন তোমার প্রতি যে অন্যায় করেছিল, আমি এখন স্পষ্ট বুঝ্‌তে পেরেছি, সেও তোমার প্রতি তাহার অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল বলে।"

প্রভা দৃঢ়কণ্ঠে কহিল—"বাবা! তাহলে তুমি আমাকে ঋণের দায়ে যতীন্ বাবুর কাছে বিক্রয় করে দিচ্ছ?"

চন্দ্রকান্ত বাবুর মুখ ফ্যাকাসে হইয়া গেল—তিনি দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হইয়া করুণ কণ্ঠে কহিলেন—"একথা তোমার মনে হচ্চে কেন মা? তুমি কি আমাকে এত হীন, এত স্বার্থপর মনে কর? বাপ কি কখনও মেয়েকে আপন হাতে বলি দিতে পারে?" বাহিরে একথা সহজ সুরে বলিলেও অন্তর মধ্যে যে ভীষণ দ্বন্দ্ব চলিতেছিল, তাহা বাহিরে দিব্য প্রকাশ পাইতেছিল।

প্রভা কহিল—"যে একদিন, একজন ভদ্র-মহিলাকে অপমানিত করতে কোন লজ্জা বোধ করে নাই, আজ কিনা আমি তারই হাতের খেলার পুতুল, একটা ভোগের সামগ্রী হতে যাচ্ছি। তুমি কি মনে কর যতীন্‌বাবু আমাকে চান, তা নয়, তিনি আমার এই দেহটাকে চান, বড় নির্লজ্জার মত কথাগুলো বলে ফেল্লুম, কিন্তু বাবা, আমার মনের ভিতর যে কত বড় তুফান বয়ে যাচ্ছে, সে যদি তুমি জান্‌তে তা হলে আমায় বোধ হয় ক্ষমা করতে।"

চন্দ্রকান্ত বাবু স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার মুখ হইতে কোন কথাই বাহির হইতেছিল না। তিনি নীরবে কাতর দৃষ্টিতে কন্যার দিকে চাহিয়া রহিলেন। প্রভা পিতার এই কাতর ভাব—শোচনীয় দুর্দ্দশা সবই বুঝিতে পারিয়াছিল। তাহার মনের মধ্যে আশা ও নিরাশার রহস্যময় চপল-নৃত্য চলিতেছিল। কি সে করিবে? একদিকে পিতার মান মর্য্যাদা, অপর দিকে প্রভাতের বিদায় বাক্য ও অকৃত্রিম অনুরাগ আবেগ ভরে তাহাকে সেই দিকে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল। এই পিতা—যে তাহাকে ছেলে বেলা হইতে বুকে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে—নিজের কোন সুখ সুবিধা বা শান্তির জন্য কোনদিন কিছু লক্ষ্য করে নাই, আজ কিনা সে তাহার দারুণ দুর্দ্দশার সময়, তাহাকে বিপন্ন করিয়া নিজ-জীবনের সুখের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। এই দেহটা ক'দিনের জন্য? মন-মন্দিরে সে যাহাকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, সেখান হইতে ত সে দেবতাকে কেহ ছিনাইয়া লইতে পারিবে না। প্রভার মুখে একটা বিকট হাসি ফুটিয়া উঠিল—সে মনকে জয় করিল—মুখের বিষণ্ণ ভাব মুহূর্ত্ত-মধ্যে পরিবর্ত্তিত করিয়া হাসিয়া কহিল—"বাবা! তুমি আমায় ক্ষমা কর, তুমি যতীন্ বাবুকে বল,, আমি তাঁকে বিবাহ করবো। আমি নিজের ভাল-মন্দ সব সময় বুঝ্‌তে পারি না বাবা, তাই সময় সময় তোমার মনে আঘাত দিই।"

চন্দ্রকান্ত বাবু অশ্রু-সংবরণ করিতে পারিলেন না, কাঁদিয়া ফেলিলেন—এবং প্রভাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন—"মা, আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি—কত বড় অন্যায়, কত বড় নির্ম্মম নিষ্ঠুর ব্যবহার তোর উপর কচ্ছি। কত বড় দুর্ব্বল আমি—তবু তুই—

প্রভা গলিয়া গেল—ধীরে অথচ দৃঢ়কণ্ঠে কহিল—"বাবা! তুমি কোন দুঃখ করো না। তোমার তৃপ্তি ও শান্তির জন্য আমি কি একটু সামান্য স্বার্থও বিসর্জ্জন করতে পারি না?"

"মা, আমি জানি যে আমার কথায় কোন ফল হবে না, তবু আমি তোর বাপ, আমি কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ কচ্চি—তুমি সুখী হবে।"

প্রভা মনে মনে কহিল—"এমন করিয়া জীবন বলি কি কেহ আজ-কালকার দিনে দিয়াছে? দেহ—এত হেয়—বিলিয়ে দিচ্ছি। মনকে আমি যে ভালবাসার সঞ্জীবনী-মন্ত্রে পবিত্র করেছি, সেখানেই আমার সার্থকতা। ঈশ্বর, আমায় শেষ রক্ষা কর্‌তে বল দাও।

গিরিডি ক্ষুদ্র সহর। দুই একদিনের মধ্যেই প্রচার হইয়া গেল যে প্রভার সহিত যতীনের Engagement পাকাপাকি হইয়া গিয়াছে, আর দুই সপ্তাহের পরেই বিবাহ হইবে। যতীনের স্বভাব চরিত্রের কথা ত সেখানে কাহারও অজ্ঞাত ছিল না, বিশেষ প্রভার প্রতি একদিন সে যে অন্যায় ব্যবহার করিয়াছিল তাহাও অনেকে জানিতেন। এক্ষণে সময় বুঝিয়া কেহ কেহ কহিলেন "ভেতরে ভেতরে অনেক দিন থেকেই গোল চলছিল, এবার শেষ রক্ষা হলো না বলেই ত বিবাহ হচ্চে।

যতীন্ অত্যধিক আনন্দের সহিত বিবাহের নানা আয়োজনে প্রবৃত্ত হইল। মিঃ চৌধুরী ও চৌধুরাণী ইহাতে বেশী পরিমাণে সন্তুষ্ট হইয়াছিল। দুই সপ্তাহ পরেই বিবাহ হইবে, কাজেই যতীনের আর

কলিকাতা যাওয়া হইল না। অনীতার সহিত প্রভাতের বিবাহের প্রস্তাবটা এই নূতন আনন্দের মধ্যে চাপিয়া গেল।

অনীতা মিসেস্ চৌধুরাণীকে কহিল—"মা, দাদার বিয়ের ত এখনও অনেকটা বিলম্ব আছে। আমি কেন কলেজ কামাই করে পড়াশুনাটা নষ্ট করি। আমার কল্‌কাতা যাবার ব্যবস্থা করে দাও।" অনীতার প্রাণেও একটা অভিমান আসিয়াছিল—প্রভাত তাহাকে হেলা করিতে পারে এমনই কি সে হেয়? না, সে আর বিবাহই করিবে না। লেখাপড় শিখিয়া দেশের দশটা কাজে লাগিয়া যাইবে।

বরাবর সে যেমন একাকিনী কলিকাতা চলিয়া যায়, এবারও তেমনি ভাবে যতীন্ তাহাকে ষ্টেসনে তুলিয়া দিয়া আসিল। যতীনের আজ কাল কোন স্থানেই বেশীক্ষণ থাকিতে ইচ্ছা হইত না। বহুক্ষণই চন্দ্র-কান্তবাবুর বাড়ীতে কাটিয়া যাইত। কোনদিন ভোরে যাইয়া ফিরিতে হয়ত বেলা একটা বাজিয়া যাইত। বিকেলে যাইয়া রাত্রি যে কটা বাজিয়া যাইত সেদিকে কোন লক্ষ্যই থাকিত না।

২৫

যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। জার্ম্মেনেরা সন্ধি পত্রে সাক্ষর করিয়াছে। বাঙ্গালী সৈন্যেরা দেশে ফিরিবার আদেশ পাইয়াছে। আদেশ পাওয়া মাত্রই দলে দলে দীর্ঘ বিপদ-সঙ্কুল প্রবাস হইতে যে যার ঘরে ফিরিয়াছে। সুধীর অবকাশ পাইয়া ভারতবর্ষের নানাস্থান দেখিয়া ফিরিতে একটু বিলম্ব করিয়া ফেলিল। কলিকাতা হইতে গিরিডি ফিরিতে হইবে—কাজেই সে দিল্লী হইতে বরাবর কলিকাতা গামী ডাক গাড়ীতে রওয়ানা হইল। মধুপুর ষ্টেসনে আসিলে পর কোন পরিচিত, চেনা মুখ দেখা যায় কি না সেদিকে লক্ষ্য করিতেছিল, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না। সে দিল্লী হইতে প্রভার নিকট এক পত্র দিয়াছিল, ভাবিয়াছিল হয় ত

তাহারা কেহ ষ্টেসনে আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে, কিন্তু কই, কেহই ত আসিল না। তখন সে স্থির করিল যে পত্র না লিখিয়া তার করিলেই ত ভাল হইত। চিঠি হয় ত আজও পৌছায় নাই। প্রকৃত পক্ষে তাহাই ঘটিয়াছিল। সুধীরের কোন পত্র প্রভা বা চন্দ্রকান্ত বাবু পান নাই। যদি পাইতেন তাহা হইলে পিতা-পুত্রী নিশ্চয়ই ছুটিয়া আসিতেন। সুধীর বীণাকেও তাহার বোর্ডিং এর ঠিকানায় পত্র লিখিয়াছিল। বীণার কাছে সে বরাবরই পত্র দিত, বীণার জন্য সে দেশের টাকা, মোহর, খেলনা আরো কত কি ছোট খাটো আশ্চর্য্য জিনিষও সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল। এই ছোট বোন্‌টিকে সত্য সত্যই সে প্রাণ দিয়া ভাল বাসিত, সারা পথে বীণার হাসি মাখা স্নেহময়ী মূর্ত্তি খানি মনের মধ্যে ভাসিতেছিল।

সে যে সেকেণ্ড ক্লাস কম্পার্টমেণ্টে ছিল তাহারি পাশে একটা লেডিস্ কম্পার্টমেণ্ট হইতে একটী বাঙ্গালী মেয়ে মুখ বাড়াইয়া ঘন ঘন তাহার দিকে লক্ষ্য করিতেছিল। সুধীর সেদিকে বড় একটা লক্ষ্য করিল না। মধুপুর হইতে গাড়ী ছাড়িয়া দিয়াছে—এক্সপ্রেস ট্রেণ দ্রুত চলিতেছে—দুই দিকের পাহাড়গুলি ধুসর শ্রীতে শোভমান—হঠাৎ পাশের গাড়ী হইতে রমণী কণ্ঠের একটা চীৎকার শোনা গেল। সুধীর গাড়ীর গদি মোড়া বিছানার উপর আরাম করিয়া অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় বাহিরের দিকে চাহিয়াছিল, হঠাৎ চীৎকার শুনিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া মুখ বাহির করিয়া তাকাইয়া ও-কক্ষের কিছুই দেখিতে পাইল না। আবার আর্ত্তনাদ—সুধীর আর নীরব থাকিতে পারিল না, সে তাড়াতাড়ি কোনক্রমে ট্রেণের গা বাহিয়া অপর কক্ষের দরজার নিকট যাইয়া তড়িৎ গতিতে দরজা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল—একজন ইউরোপীয়ান যুবক সেই যুবতীটির সহিত ধস্তাধস্তি করিতেছে। যুবতীর বসন ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, চুল খুলিয়া

গিয়াছে, হাতের কোন কোন অংশ ধ্বস্তাধ্বস্তিতে রক্তে ভাসিয়া গিয়াছে। সুধীর ক্ষণমাত্র অপেক্ষা না করিয়াই ইউরোপীয়ান যুবকের মুখের উপর এক ঘুসি বসাইয়া দিল। দুর্বৃত্ত এইরূপ আকস্মিক আক্রমণের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। সে ঘুরিয়া বেঞ্চির উপর উপুড় হইয়া পড়িল—কিন্তু সে এক মুহূর্ত্ত মাত্র। তার পর কোন কথা না বলিয়া দরোজার দিকে যাইতেই সুধীর তাহার গলা ধরিয়া টানিয়া আনিল। সুধীরের বজ্রমুষ্টি এড়াইয়া কোনরূপেই ইউরোপীয়ান যুবক মুক্ত হইতে পারিল না। সে মিনতির স্বরে কহিল—"আমায় ক্ষমা কর, আমি রেলের কর্ম্মচারী, আমার গুরুতর শাস্তি হবে। আমার অন্যায় হয়েছে। আমায় ক্ষমা কর।"

সুধীর গর্জ্জিয়া কহিল—"Rascal, তোমায় ক্ষমা, চুপ করে বসে থাক। এসানসোল ষ্টেসনে এলেই তোমায় পুলিশের হাতে দেব।"

ইউরোপীয়ান যুবকের নেশার ঝোঁক ও প্রবৃত্তির নীচতা দূরে সরিয়া গিয়াছিল। সে পুনরায় কহিল—"বাবু, তুমি আমায় ছেড়ে দাও, এই Lady আমার মা, আর আমি এমন কাজ করবো না।"

অনীতা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছিল। এইবার ধীরে ধীরে তাহার জ্ঞান হইল, চোখ মেলিয়া দেখিতে পাইল সেই খাকির পোষাক পরা বলিষ্ঠ সুন্দর যুবকটি ইউরোপীয়ানের হাত ধরিয়া বসিয়া আছে।

অনীতা কোন কথা কহিল না, সে অপলক নেত্রে সুধীরের দিকে চাহিয়া রহিল। এমন সুন্দর পুরুষ, এমন বীর সাহসী পুরুষ—সে কি না বাঙ্গালী! সে ভাল করিয়া মনে করিতে পারিতেছিল না, কোথায় ইহাকে দেখিয়াছে—যদি মনে পড়ে এজন্য আর কোন কথা না কহিয়া চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল।

এদিকে গাড়ী আসিয়া ষ্টেসনে দাঁড়াইতেই ইউরোপীয়ান পলাইবার চেষ্টা করিল—কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। সুধীর মেয়েটাকে

সম্বোধন করিয়া কহিল—"আপনি নিশ্চিন্ত মনে অপেক্ষা করুন। আমি এ বেটাকে ষ্টেসন মাষ্টারের কাছে নিয়ে যাচ্ছি। ষ্টেসন মাষ্টার ও সেখানকার সুনিপুণ কর্ম্মচারীরা সমুদয় অবস্থা শুনিয়া সুধীরকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া ঐ পাপিষ্ঠকে যথেষ্ট গালাগালি দিয়া হাজতে পাঠাইয়া দিলেন। তারপর ষ্টেসন মাষ্টার জিজ্ঞাসা করিলেন "এ মেয়েটী কি আপনার পরিচিত?"

"আজ্ঞে না।"

"আপনি কবে সৈন্যদল থেকে ফিরে এলেন?"

"অনেক দিন, তবে নানা দেশ ঘুরে ফিরতে একটু বিলম্ব হয়ে গেল।"

পুলিশ কর্ম্মচারীরা প্রয়োজন মত পরিচয় ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া কি ভাবে মোকদ্দমা ঘটিবে সকল উপদেশ ও পরামর্শ দিয়া যখন অনীতার কাছ হইতে সমুদয় আবশ্যকীয় বিবরণ সংগ্রহ করিতেছিল সেই সময় সুধীর তাহার পরিচয় পাইয়া কহিল—"তুমি কি অনীতা?"

অনীতা হাসিয়া কহিল—"হ্যাঁ, তুমি কি আমাদের সুধীরদা?"

"হ্যাঁ। তুমি এত বড় হয়েছ, অনীতা। এত অপমান ও নির্য্যাতনের মধ্যেও অনীতার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে হাসি সুধীরের কাছে উষার গায়ে রাঙা মেঘের প্রথম উন্মেষের মত বড় মধুর লাগিল। অনীতার কপোল গোলাপের মত লাল হইয়া গেল। ষ্টেসন মাষ্টার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি ওঁকে চেনেন?"

অনীতা পরিষ্কার ইংরাজিতে কহিল—"প্রথমে চিনতে পারিনি, এখন চিনতে পেরেছি: ইনি আমাদের আত্মীয়। আজ চার বছর যুদ্ধে গিয়েছিলেন, তাই প্রথমটায় চিনতে পারিনি।"

ষ্টেসন মাষ্টার কহিলেন—"ইনি যদি আপনার সঙ্গে এক গাড়ীতে

যান, তা হলে বোধ হয় আপনার কোন আপত্তির কারণ নাই। এ দুর্ঘটনার জন্য আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। আপনাকে সব কথা বিচারকের কাছে বল্‌তে হবে। এরকম দুর্বৃত্তেরাই আমাদের রেল কর্ম্মচারীর নামে দুর্ণামের সৃষ্টি করে।"

ষ্টেসন মাষ্টারের ও পুলিশ কর্ম্মচারীদের সৌজন্যে অনীতা ও সুধীর মুগ্ধ হইয়া গেল। ষ্টেসন মাষ্টার তাহাদের সুব্যবস্থা করিয়া দিয়া গাড়ী ছাড়িবার অনুমতি দিলেন। যাত্রীর দল সবকথা শুনিতে পাইয়াছিল, তাহারা গাড়ী ছাড়িবার পূর্ব্বে সুধীরের দিকে ফিরিয়া 'বন্দেমাতরম্‌' ধ্বনি করিয়া উঠিল।

একজন সংবাদ পত্রের রিপোর্টার সেই গাড়ীতে ছিলেন, তিনি সুধীরের নাম, পরিচয় ও রেজিমেন্টের নম্বর টুকিয়া লইলেন।

সুধীর কহিল, "এ নিয়ে সংবাদ পত্রে একটা হৈ চৈ বাধাবেন না যেন, বিশেষ এই ভদ্রমহিলার, নাম ও পরিচয় প্রাকাশ করবেন না।"

গাড়ী ছাড়িয়া দিল। অনীতা ও সুধীর দুইজনে দুই বেঞ্চের উপর মুখোমুখি হইয়া বসিল। অনীতা প্রথমে কথা কহিল—

সে ডাকিল—সুধীর দাদা ?

কম্পিত কণ্ঠে সুধীর কহিল—কি অনীতা ?

অনীতা—এই একটা মাত্র সম্বোধনে অনীতার মুখ লাল হইয়া গেল, সারা দেহে রোমাঞ্চ উপস্থিত হইল। কেন তাহার এমন হইল ?

"আজ যদি, তুমি না থাক্‌তে তাহলে কি দুর্দ্দশা হত আমার সুধীর দা ?

"ভগবান তোমায় রক্ষা করতেন—অনীতা।"

"নিশ্চয়, তাইত, তিনিই তোমায় এনে দিয়েছেন। তুমি কি আজই দেশে ফিরছ ? গিরিডি আগে গেলে না কেন ?"

"আমায় যে আগে কল্‌কাতা হয়ে যেতে হবে। ভাল কথা, গিরিডির খবর ভাল? তোমাদের বাড়ীর, আমাদের বাড়ীর সব ভাল ত?

"হাঁ, সবই ভাল। একটা নূতন খবর শোন। প্রভাদিদির সঙ্গে আমার দাদার আর দু সপ্তাহ পরেই বিয়ে হবে।'

"সত্যি নাকি?'

'তা যাই বল দাদা, এরকম বিয়ে না হলেই ভাল হত। আমার দাদা কি তাঁর যোগ্য?"

অনীতার এই সকল স্বীকারোক্তিতে সুধীর মুগ্ধ হইয়া কহিল—"ভালবাসা কি কখন ভাল মন্দ বিচার করে অনীতা?"

অনীতা হাসিয়া কহিল—"তুমি বুঝি মনে কর, প্রভাদিদি দাদাকে ভাল বেসেছেন! সে কখনও নয়, সে অনেক কথা।" তাহাদের আভ্যন্তরীণ কথা এখানে প্রকাশ করা সে কোন মতেই সঙ্গত মনে করিল না, বলিল, "সব কথা বাড়ী গিয়েই শুন্‌বে।"

সুধীরও সেদিকে কোনও কৌতূহল প্রকাশ না করিয়া কহিল—"বাবা বেশ ভাল আছেন?"

"হাঁ. দুষ্টু বীণা কেমন আছে?"

অনীতা হাসিয়া কহিল—"তুমি বুঝি মনে কর, সে এখনও দুষ্টু আছে, সে জলপানি নিয়ে আই, এ, পাশ করেছে, বি, এ, পড়ছে, বীণা বোর্ডিঙেই আছে।"

"তুমি কি কর অনীতা?"

"কেন, আমরাও দু'জনে বরাবর এক সঙ্গেই পড়ি। আমি কিন্তু জলপানি-টলপানি পাই নি—বুঝ্‌লে?"

"আমাকে ও সব লেখাপড়ার কথা বল না, অনীতা। আমার লেখা

পড়া হচ্চে, ঘুষি মারা, গুলি ছোড়া এই সব। বিদ্যের কথা বললেই আমি স্তব্ধ হয়ে পড়ি।"

অনীতা গর্ব্বে ও আনন্দের সহিত কহিল—"হাঁ, ছাই বিদ্যে, রেখে দাও বিদ্যে! তোমার মত পুরুষ যারা তারাইত মানুষ, কতকগুলো বই মুখস্থ পড়া, ডিস্‌পেপটিক, ভীরু দুর্ব্বল গুলো কি মানুষ নাকি? তোমরাই দেশের গৌরব। আজ্‌কে যে ভাবে তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করলে—ওরকম একশো কাপুরুষ থাক্‌লে কি তারা কেউ ছুটে এসে সাহায্য করতো। শুধু মুখে হায়! হায়! কর্‌তো, আর কান্না কাটি করে বক্তৃতা দিয়ে কাউন্সিলে ভেবা গঙ্গারামের দল প্রশ্ন তুল্‌তো, ফল যা হত তা ত বুঝ্‌তেই পার।"

এতটুকু ছোট মেয়ে আজ এত কথা বলিতে শিখিয়াছে শুনিয়া সুধীর না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। সুধীরকে হাসিতে দেখিয়া অনীতা একটু অপ্রস্তুত হইয়া কহিল—"সুধীরদা, তুমি এত হাস্‌ছো যে?"

"না—আমি বড় নিষ্ঠুর। তোমার কোথায় লেগেছে, সে খোঁজও একবার করিনি। বড় লেগেছে কি?'

অনীতা তাহার কনুইয়ের ডগা পর্য্যন্ত জামাটা সরাইয়া কহিল "তেমন লাগেনি।" সুধীর হাত খানি ধরিয়া দেখিয়া কহিল—"লাগেনি কি? উঃ এযে অনেকটা কেটে গেছে। তাইত—" একটা ব্যকুলতার ভাব তাহার মুখে প্রকাশ পাইল।

অনীতা সেই স্পর্শে শিহরিয়া উঠিল। কি মধুর! কি সুন্দর এ স্পর্শ!

আজ অনীতা বুঝিতে পারিল—কেন সে প্রভাতের সহিত তাহার বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় মনে মনে একেবারেই দুঃখিত হয় নাই।

হঠাৎ হাওড়া ষ্টেসনে কুলির ডাক শুনিয়া উভয়ের চমক ভাঙ্গিল। ষ্টেসনে বীণা ও বোর্ডিংএর কয়েকটি মেয়ে তাহাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছিল। অনীতার মুখে তাহারা সুধীরের সেই অপূর্ব্ব বীরত্ব কাহিনী শুনিয়া অবাক্ বিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সুধীর তাহাদের সকলের সহিত মধুর আলাপ করিয়া একটা বোর্ডিংএর দিকে চলিয়া গেল। বোর্ডিঙের মেয়েরা অপলক নেত্রে তাহার দিকে বিস্ময়াকুল হইয়া চাহিয়া রহিল। অনীতা শুধু কহিল—"সুধীর বাঙ্গালীর গৌরব—দেশের গৌরব।" বীণা ইহাতে খুব সন্তুষ্ট হইয়া কহিল—ছোড়দা বরাবরই Gallant.

অনীতার প্রাণে যে নূতন সুরের ঝঙ্কার বাজিয়া উঠিয়াছিল সুধীরের প্রাণেও কি তাহা ধ্বনিত হয় নাই?

২৬

বিবাহের মাত্র দুই দিন বাকি। উভয় বাড়ীতেই সাধ্যানুযায়ী আয়োজন ও ব্যবস্থা চলিয়াছে। নিমন্ত্রণ পত্র বাহিরে ও সহরে বিলি হইয়া গিয়াছে। সে দিন বিকাল বেলা খুব ভারি একটা লেপাফা ও আরও কতকগুলি ডাকের চিঠি চন্দ্রকান্ত বাবু পাইয়া বিস্মিত হইলেন। শীঘ্র এক সঙ্গে এমন একরাশ চিঠি তিনি অনেকদিন পান নাই। প্রথমে তিনি ভারি চিঠিখানা খুলিয়া আনন্দে খানিকক্ষণ চুপ হইয়া রহিলেন—চিঠিখানা কোল কোম্পানী হইতে আসিয়াছে, কোম্পানী বেশ মোটা ডিভিডেণ্ট ডিক্লেয়ার করিয়াছে। দুই বৎসরের ডিভিডেণ্ট একসঙ্গে পাওয়ায় তাহার অনেক টাকা প্রাপ্য হইয়াছে। আর কতকগুলি চিঠি বিবাহে আনন্দ প্রকাশ করিয়া বন্ধুবান্ধবেরা ও আত্মীয় স্বজনেরা লিখিয়াছেন। অপর চিঠিখানা রমণীবাবু লিখিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

প্রিয় চন্দ্রকান্ত।

অনেক দিন তোমার কুশল সংবাদ পাই নাই। শ্রীমান্ প্রভাত আসিয়া তোমার ব্যবহারের বিষয় যেরূপ বলিয়াছে তাহাতে আমার প্রাণে যে কত বড় আনন্দ হইয়াছে, তাহা পত্রে প্রকাশ করা চলে না। একটা কথা। তোমার সঙ্গে আমার যে বাল্য বন্ধুত্ব এতদিন আমাদিগকে এক আত্মা ও এক প্রাণ করিয়া রাখিয়াছিল আজ তাহাকে আত্মীয়তার দৃঢ় বন্ধনে চির দিনের জন্য বাঁধিয়া রাখিতে চাই। শ্রীমান্ প্রভাতের সহিত মিঃ চৌধুরী তাহার কন্যার সম্বন্ধ উপস্থিত করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রভাত বলিল সে তোমার জ্যেষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া প্রভা ব্যতীত আর কাহাকেও বিবাহ করিবে না। শ্রীমান্ এক্ষণে কলিকাতায় আছে, শীঘ্রই পুনরায় দেশের জমিদারীতে যাইবে। সে ব্যবসায় করিবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া জমিদারীর বিবিধ উন্নতির জন্য মনোনিবেশ করাই স্থির করিয়াছে। আমার ইচ্ছা, শুভ পরিণয় সম্পন্ন করিয়া বধূমাতার সহিত একত্রে দেশে যাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তোমার ইহাতে কোনও অমত হইবে না। সামজিক দিক্ দিয়াও তোমরা আমাদের করণীয় ঘর। তুমি একটা দিন স্থির করিয়া লিখিও। আমি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব। পত্রোত্তর শীঘ্র দিও। আশা করি, তুমি সর্ব্বাঙ্গীন কুশলে আছ। ইতি

তোমার রমণী।

চন্দ্রকান্ত বাবু একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। এখন উপায়? এরূপ সময়ে প্রভা চায়ের সরঞ্জাম লইয়া সেখানে উপস্থিত হইল। চন্দ্রকান্তবাবুকে এক রাশ চিঠি হাতে করিয়া ভাবিতে দেখিয়া সে কহিল, "বাবা, তুমি অমন চুপটি করে কি ভাবছো?" চন্দ্রকান্ত বাবু কোন কথা না কহিয়া চিঠিগুলি তাহার হাতে দিয়া কহিলেন—"মা, আমি ত

কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পাচ্ছি না। তুমি চিঠিগুলি পড়, তার পর বলে দাও, আমি কি করবো, আমি কোথায় দাঁড়াব।"

প্রভা সব চিঠি পড়িয়া কহিল—"বাবা, তাহলে বিধাতা এতদিনে তোমার দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন। তুমি ঋণ মুক্ত হলে। এইবার যতীন্ বাবুর টাকাটার কতকটা দিয়ে ফেল। আবার ডিভিডেণ্ট পেলে বাকীটা দিয়ে ফেল। তার পর—যা আস্‌বে, বেশ চলে যাবে।"

প্রভার মনের ভিতর যে কি করিতেছিল, তাহা সেই বুঝিতে পারিতেছিল। মুখ তাহার একেবারে সাদা হইয়া গিয়াছিল। রমণী বাবুর চিঠি সম্পর্কে সে কোন কথা কহিতেছে না দেখিয়া চন্দ্রকান্ত বাবু কহিলেন—"তুমি রমণীর চিঠি পড়েছ ?"

"হ্যাঁ বাবা!" তাহার দুই চক্ষু বাহিয়া মুক্তার মত রাশি রাশি অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

"এখন উপায় কি মা ?"

প্রভা দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতেছিল না, তাহার পা থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। সে একখানা সোফার উপর বসিয়া কহিল—"কিসের উপায় বাবা ?"

"এই রমণীকে কি জবাব লিখ্‌বো ?"

"কি আর জবাব লিখ্‌বে ? লিখে দাও অসম্ভব। বিবাহ স্থির হয়ে গেছে।"

"কেন, এ সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিলে হয় না। যতীনের টাকা আমি কালই দিয়ে ফেল্‌বো। তবেই ত গোল চুকে যায়। আমি তোমাকে মা এমন করে বলি দিতে পারি না। আমি কি বুঝ্‌তে পারি না, এ তোমার—

প্রভা ত্রস্তে বাধা দিয়া কহিল—"বাবা, এমন কথা মুখে এন না, আমার জন্যে তুমি মিথ্যাবাদী হবে ? আমার জন্যে তুমি দশ জনের

কাছে নিন্দাভাজন হবে—সে আমি কোন মতেই সহ্য করতে পারবো না। তারপর মনে কর, আজ যদি তুমি ডিভিডেণ্টের টাকা না পেতে, তা হলেই বা কি হত? আমার—আমার জন্য তুমি কিছু ভেব না। মানুষ কি ভালবাসাকে সুধু স্বার্থের জন্য, ভোগের জন্যই গ্রহণ করে? মুক্ত কণ্ঠে বলছি,—আমি প্রভাত বাবুকে ভাল বেসেছি, তার কাছে এক-রূপ প্রতিজ্ঞা বদ্ধও হয়েছিলুম, কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা যখন তা নয়, তখন তার বিরুদ্ধে আমি দাঁড়াব না। মানুষ কত ভাবেই না পিতৃ ঋণ শোধ করার চেষ্টা করে কিন্তু তবু কি তা শোধ যায়!"

প্রভা সেখানে আর অপেক্ষা করিল না। সে তাহার শোবার ঘরে যাইয়া দেখিল—তাহার ছোট টেবিলখানার উপর একখানা ভারি লেপাফা পড়িয়া আছে। দাসী কখন যে এই চিঠিখানা রাখিয়া দিয়াছে, সেদিকে লক্ষ্য করিবার তাহার কোন সুযোগ হয় নাই। পত্রখানি প্রভাতের। প্রভাত এতদিন কেন তাহাকে পত্র লিখিতে পারে নাই, তাহার আনু-পূর্ব্বিক বিবরণ বিবৃত করিয়া উপসংহারে লিখিয়াছে—"আর বিলম্ব সহ্য হয় না, এতদিন যাহার ছবি প্রতি মুহূর্ত্তে ধ্যান করিয়া আসিয়াছি, এক্ষণে তাহাকে বরণ করিয়া হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিতে চাই। আমি কল্পনায় যে চিত্র অঙ্কিত করেছি, বাস্তব-জীবনে তোমার সাহায্যে তাহাই জীবন্ত ভাবে গড়ে তুলবো। বাবা,—তোমার বাবাকে চিঠি দিয়েছেন। তাঁর সম্মতি এলেই এক সপ্তাহের ভিতর তোমাকে প্রেমের অটুট বন্ধনে বেঁধে আনবো। কত কথা মনে পড়ে, সব কথা লিখ্‌বার অধিকার সমাজ এখনও আমাদের দেন নি।"

প্রভা, চিঠিখানা পড়িতে পড়িতে ফুলিয়া ফুলিয়া বিছানার উপুর হইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। আজ তাহার প্রাণে যে কি করিতেছে তাহা অন্তর্য্যামীই জানেন। বহুক্ষণ পরে সে চন্দ্রকান্ত বাবুর

হাতে পত্রখানি দিয়া কহিল—"বাবা, আর কটা দিন আগে যদি এ চিঠি আস্‌তো, তা হলে আমি কি করতেম জানি না। তুমি রমণী বাবুকে এ দিকের সব কথা লিখে তার করে দাও।"

চন্দ্রকান্ত বাবু বিগলিত কণ্ঠে কহিলেন—"এ ভুলের কি সংশোধন হয় না?"

প্রভা গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল—"সে আর হয় না বাবা।"

চন্দ্রকান্ত বাবু প্রভার কথানুসারে সব কথা খোলসা করিয়া লিখিয়া সংবাদ প্রেরণ করিলেন। প্রভাত—সব শুনিল—সব দেখিল। কিন্তু সে কোন কথা কহিল না। রমণী বাবু পুত্রের বিমর্ষ ভাব দেখিয়া কহিলেন—"বাবা, তাহলে মিঃ চৌধুরীর কন্যার সঙ্গেই সম্বন্ধটা স্থির করে ফেলি—"

প্রভাত বাধা দিয়া কহিল—"বাবা! তোমাকে ঋণদায় হতে মুক্ত না করে, আমি নিজের সুখটাকেই বড় করে দেখ্‌তে পেয়েছিলুম কি না, তাই বিধাতা আমায় শিক্ষা দিলেন। বাবা, আজ আমি একবার গিরিডি যাব।"

রমণী বাবু কহিলেন—"বেশ।"

"আচ্ছা বাবা, আমাদের কি প্রভাকে কোন উপহার দেওয়া উচিত নয়?"

রমণী বাবু কহিলেন—"নিশ্চয়। তুমি যা পছন্দ কর, যত টাকাই হউক না কেন, কিনে নিও।" প্রভাত সন্তুষ্ট মনে সারাদিন জুয়েলারি দোকানে ঘুরিয়া পাঁচ হাজার টাকা মূল্যের একটী নেকলেস্ ক্রয় করিয়া সেদিন রাত্রির গাড়ীতে গিরিডি চলিয়া গেল। গিরিডি পঁহুছিয়া—সে বরাবর ডাক-বাংলায় উঠিল।

সন্ধ্যার সময় গিরিডির ব্রাহ্ম-সমাজ পত্র পল্লবে সুসজ্জিত। বর-কনে উপস্থিত।—পাত্রপক্ষ ও কন্যাপক্ষ দুইজনে প্রফুল্ল মনে কথাবার্ত্তা বলিতেছেন। এদিকে বীনা, অনীতা, সুধীর সকলেই আসিয়া পঁহুছিয়াছিল।

বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। আত্মীয় বন্ধু বান্ধবেরা বিবিধ উপহার দিতেছেন। এরূপ সময়ে হঠাৎ প্রভাত আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। প্রভা তাহাকে দেখিবামাত্র ফাঁসী-কাঠের আসামীর মত ফ্যাকাসে হইয়া গেল। প্রভাত কোন কথা বলিতে পারিল না—সে কম্পিত হস্তে প্রভার হাতে নেকলেস্ ছড়া তুলিয়া দিয়া কহিল—"প্রভা, আশীর্ব্বাদ করি, তুমি সুখী হও।" সে আর একটীও কথা না কহিয়া দ্রুত বাহিরের দিকে অগ্রসর হইল। প্রভা একটী কথাও কহিতে পারিল না—তাহার দুই চোখে আজ শ্রাবণের বর্ষণ ধারা নাবিয়া আসিয়াছিল। সে স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না—মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। অনীতা প্রভাতকে দেখিতে পাইয়া রাস্তার পার্শ্বে যাইয়া ডাকিল—"প্রভাত বাবু!" তখন প্রভাতের মোটর আধ মাইল দূরে চলিয়া গিয়াছে। এই ঘটনাটি এত অল্প সময়ের মধ্যে হইয়া গেল যে কেহ কোন কথা বলিবার অবকাশ মাত্র পান নাই।

এ বিবাহের অল্প কয়েকদিন পরেই অনীতা ও সুধীরের বিবাহ হইয়া গেল।

প্রভাত, দেশের কাজে তাহার জীবন উৎসর্গ করিল। তাহার হৃদয়ের প্রেম আজ বিশ্বজনীন রূপে দেশের সেবায় অর্ঘ্য প্রদত্ত হইয়াছে। রমণী বাবু ঋণ মুক্ত হইয়া প্রফুল্ল মনে পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন। প্রভাত বিবাহ করিল না, এ কষ্টটাই শুধু শেষ জীবনে তাহাকে পীড়া দিয়াছিল।

দেশে শিক্ষা বিস্তর, অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব দূর করিবার জন্য চেষ্টা,—বিলাসিতার বন্ধন মুক্ত হইয়া কেমন করিয়া ভদ্র অভদ্র সর্ব্ব শ্রেণীর লোকেরা সরল সহজ অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতে পারে সে জন্য সে দিবা রাত্রি প্রাণ পণ করিয়া খাটে। বাড়ী বাড়ী চরকা চলিতেছে—সূতা

প্রস্তুত হইতেছে—কাপড় তৈরী হইতেছে। তাহার জমিদারীর মধ্যে জলাশয়, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, ও জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে, প্রয়োজনানুরূপ মঠ, মন্দির ও দেবালয় প্রতিষ্ঠাপিত হইয়া প্রভাতের জীবনের সাধনা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে।

কে বলিবে সে বড় লোকের ছেলে? কে বলিবে সে জমিদার? সে আপনাকে সকলের সেবক, ভাই, বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিয়া যে আদর্শ স্থাপিত করিয়াছে যদি সেই ত্যাগের আদর্শ আমাদের দেশের সকলে গ্রহণ করে তবেই দেশে জাগবে। তবেই আমরা মাতৃমন্ত্র উচ্চারণের অধিকারী হইয়া বলিতে পারিব—

"বন্দে-মাতরম্"

সম্পূর্ণ।

উপন্যাস সিরিজ

আশ্বিন ১৩১৭ হইতে বর্ষ আরম্ভ—প্রতিমাসে একখানি করিয়া বাহির হয়।
সডাক বার্ষিক মূল্য—১২৲ ষাণ্মাসিক—৬৲ প্রতি সংখ্যা—১৲
পত্র লিখিলে নাম রেজেষ্ট্রী করা হয় ও নূতন প্রকাশিত বই প্রতি দুই সংখ্যা
সকল খরচ সমেত ২।৴০ য় ভি, পি করা হয়।

প্রথম বর্ষ

১। সাধের বৌ— (দ্বিতীয় সংস্করণ, চতুর্থ সহস্র)
শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।
২। সহধর্ম্মিণী—(দ্বিতীয় সংস্করণ) শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে।
৩। বরের নিলাম—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ পাল।
৪। মুক্তি—শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত এম্, এ।
৫। প্রণয়-প্রতিমা—শ্রীযুক্ত অরবিন্দ দত্ত।
৬। কুলুই-চণ্ডী—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।
৭। পরশমণি—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।
৮। গুল-কাশেম—শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়।
৯। সীতার ভাগ্য—শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন মজুমদার।
১০। দরিয়া—শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।
১১। ভবানীপ্রসাদ—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ পাল।
১২। যোগী-গৃহী—শ্রীমতী মালিনী দেবী।

দ্বিতীয় বর্ষ

১। বামুনের মেয়ে—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
২। লক্ষ্যপথে—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।
৩। পরিণয়—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায়
৪। অনিমন্ত্রিতা—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়।
৫। লক্ষ্মী—শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী।
৬। হিন্দু-গৃহ—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ পাল।
৭। শিব-রাত্রি—শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত, এম্, এ।
৮। দেশের মেয়ে—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ পাল।
৯। নন্দন-পাহাড়—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত।
১০। ঋণের দায়—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।
১১। দেশের ছেলে—শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত এম, এ।

(দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক)

৭। বঙ্গ-সমাজ—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
৮। রত্ন-বিনিময়—শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত, এম, এ
৯। ধর্ম্মঘট—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ পাল
১০। আরম্ভেই শেষ—শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী
১১। পরের মেয়ে—শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী
১২। নীলকুঠি—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ পাল

একত্রে সিল্কে বাঁধাই, রূপার জলে নাম লেখা—

দ্বিতীয় খণ্ড

মূল্য মাত্র—২।০।

দ্বিতীয় বর্ষ

(প্রথম ষাণ্মাসিক)

১৩। পথের পথিক—শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
১৪। প্রেমিক-সন্ন্যাসী—শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বসু
১৫। মৃত-প্রিয়া—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
১৬। পাড়াকুঁদুলী—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ পাল।